গহিন রাত মাতাল গাঙ

মোহন নস্কর

সাহিত্যায়ন
১/১ বি, ডাঃ অমল রায় চৌধুরী লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬৩

প্রচ্ছদ : মদন সরকার

অঙ্গসজ্জা : অনুপম রায়

প্রকাশক :
সুজয় ভৌমিক । সাহিত্যায়ন
১/১ বি, ডাঃ অমল রায় চৌধুরী লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
অরিজিৎ কুমার । টেক্‌নোপ্রিণ্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

উপন্যাসের চরিত্ররা কেউ কাল্পনিক নয়। কাদামাটি মাখা ওই মানুষগুলো দৈনন্দিন জীবনে আমাদের লোক। আমাদের প্রতিবেশী। জীবনযুদ্ধের শরিক। আমি ওদের দেখেছি খুব কাছ থেকে। দেখেছি ওদের জীবনজীবিকা। ওদের হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখ-ক্রোধ-ঘৃণা-ভালবাসা। দেখেছি ওদের সংগ্রাম। সাহিত্যের প্রয়োজনে কাদামাটি মাখা চরিত্রগুলোকে সামান্য অদলবদল করে গড়েছি এ কাহিনীর শরীর।

মোহন নস্কর

উৎসর্গ

মা, শুভজিত এবং নমিতা কে

গহিন রাত মাতাল গাঙ

গহিন রাত মাতাল গাঙ

গহিন রাত মাতাল গাঙ

লেখকের অন্য বই

ঝড়ের সংলাপ

চটকলিয়া

বনবিবির ডাক

গতকাল থেকেই মুখ ভারী। ঘন সীসা রঙের মেঘ সেঁটে বসেছে আকাশের শরীরে। আজ দুপুর থেকে শুরু হয়েছে ঝিমঝিমে বৃষ্টি। সঙ্গে মাতাল বাতাস। কখনো বাড়ছে। কখনো কমছে। সন্ধ্যার আঁধার ভেঙে আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ ঝিলিক হানছে। ব্যাঙ আর ঝিঁঝির দল মত্ত উল্লাসে বিচিত্র ঐকতান তুলছে ডোবার পাড়ে। ঝোপে ঝাড়ে। ঘরের কানাচে মানকচুর পাতায় ছাঁচের জল পড়ে ছন্দোবদ্ধ ভুতুড়ে শব্দ তুলছে।

স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছে শ্রীকান্ত। ভিজে বাতাসে শীতের শিরশিরানি। খেজুরপাতার চ্যাটাই পেতে মেঝেতে শুয়ে আছে সরলা। উদোম বুকের একটা দিক চুষছে দেড় বছরের ছেলেটা।

বৃষ্টি কখনো বাড়ছে। কখনো কমছে। কখনো আসছে ঝম্‌ঝমিয়ে। আবার কখনো থেমে যাচ্ছে। দম্‌কা বাতাস বয়ে আনছে ঘন কুয়াশার মত ইল্‌শেগুঁড়ি। এই ইল্‌শেগুঁড়ি যুগ যুগ ধরে ইলিশমারাদের ঘুম ভাঙিয়েছে। আশা জাগিয়েছে। স্বপ্ন দেখিয়েছে। সমৃদ্ধি দিয়েছে। মাতাল করেছে ইলিশমারাদের। বহু উত্থান পতনের সাক্ষী এই ইল্‌শে-গুঁড়ি। ইলিশমারাদের বহু প্রজন্মের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে এর হিনে।

রাত গহিনে জেলেপাড়ার জোয়ান মরদগুলো ইল্‌শেগুঁড়ির আকর্ষণে াপ দিয়েছে মাতাল গাঙের বুকে। মৃত্যুর সাথে বাজি রেখে ছিনিয়ে নেছে সুখ সমৃদ্ধি। আপন ইচ্ছায় গড়েছে ভাগ্যকে।

— ছিকান্ত চলি আয়। বান এ্যাসবার সোময় হইছে।

বাড়ির বাইরে থেকে ডাকলো কার্ত্তিক।

মাথায় গামছা জড়িয়ে উঠোনে নামলো শ্রীকান্ত। সরলার দিকে একনজর তাকিয়ে বললো—

—বউ, হুড়কো নাগিয়ে দে, রাতে ফিরবো নি।

শ্রীকান্তের কথা শুনতে পেয়েছে, সরলার অভিব্যক্তিতে তেমন লক্ষণ দেখা গেল না। যেমন শুয়েছিল তেমনই থাকলো। আসলে সরলা আজ ভীষণ কঠোর। প্রতিজ্ঞা করেছে কিছুতেই কথা বলবে না। শ্রীকান্ত স্ত্রীর মান ভাঙাতে অনেক সাধ্যসাধনা করেছে। কিন্তু সরলাকে টলাতে পারেনি।

মাঝে মধ্যে এমন হয়। একটু আধটু ঝগড়া, গালাগাল মারামারি। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না। পুনরায় ভাব হয়। জীবন পূর্বের মত চলে। শ্রীকান্ত আজন্ম একটু গোঁয়ার-গোবিন্দ। দুম করে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে কিছু করে বসে। পরে ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়। কষ্ট পায়।

স্বীকার করে তার রুক্ষ রিক্ত জীবনে মরূদ্যানের স্নিগ্ধ শীতল ছায়া বিস্তার করে আছে সরলা। না হলে জীবনটা বাজপড়া ন্যাড়া তাল-গাছের মত নীরস। তবুও মাঝে মাঝে চণ্ডাল রাগটা ভর করে ঘাড়ে। তখনই শ্রীকান্ত ভুলে যায় হিতাহিত।

গ্রামের মানুষ কি ছিঃ ছিঃ করছে না শ্রীকান্তকে ?

পরশুই তো অনুকূল খুড়ো ডেকে বলেছে—

—হ্যাঁরে ছিকান্ত, এখন তো কাজ কাম হচ্ছে। সব প্যাটে ঢোকাচ্ছিস, দেখতে পাসনি বউটার পোঁদে ট্যানা নি। জেলেপাড়ার নাম ডোবাবি ?

সত্যি বড় লজ্জার কথা। শ্রীকান্তের আজানা নয়। কিন্তু খুড়োকে কেমন করে বোঝাবে। কাজ কাম মাঝে মধ্যে হচ্ছে সত্যি কিন্তু বাজারের নাগাল ধরতে যে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। একদিক ঢাকলে অন্যদিক উদোম হয়ে পড়ে। সংসারের বিশাল হাঁ-টাকে কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না। তার কি ইচ্ছা করে না বড়লোকের বউদের মত ভাল ভাল শাড়ি পরুক

সরলা। মুখে স্নো পাউডার মেখে, চুলে গন্ধ তেল দিয়ে অবাক করে দিক পড়শিদের। কিন্তু সব শখের মূলে সেই একটাই বস্তু। যা যুগ যুগ ধরে মানুষকে স্বর্গে তুলেছে। পাতালে নামিয়েছে। তার নাম টাকা। সেই টাকার স্থানটা শ্রীকান্তের বড় দুর্বল। ইচ্ছা আছে একশো ভাগ। সাধ্য নেই একবিন্দু।

একটা শাড়ির জন্য গত এক সপ্তাহ নানাভাবে শ্রীকান্তকে বোঝাচ্ছে সরলা। মান-সম্মান ইজ্জৎ রাখা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা মাত্র শাড়ি বর্তমান। তাও মশারির মত স্বচ্ছ। জ্যালজেলে। বাড়ির মধ্যে পরনে যাই থাক, বাইরে লজ্জা আড়াল করতে শাড়ি চাই। প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বেরুতেই হয়। এখন যে শাড়িতে শরীর ঢাকে তাকে শাড়ি বলা যায় না। ন্যাকড়া অথবা সরলাদেব ভাষায় 'কানি' বলা উচিত।

সায়া নয়। ব্লাউজ নয়। শুধু একটা শাড়ি। জেলে বউদের সায়া ব্লাউজ আকাশ কুসুম ভাবনা। এলাকায় সায়া ব্লাউজ আছে ভাগ্যবান দুই মহিলার। খগেন জানার স্ত্রী এবং তার কলেজপড়া মেয়ের। তাদের দেখেই শখ মেটায় জেলে বউরা। আড়ালে আবডালে বিচিত্র মন্তব্য চলকায়। নিজেদের ভাগ্যকে দোষারোপ করে। হা হুতাশ করে। ঈশ্বরকে গোল্লায় পাঠায়। স্বামীর অক্ষমতাকে গালাগাল করে সান্ত্বনা পেতে চায়।

সায়া ব্লাউজহীন শরীরে 'কানি' পরে বাড়ির বাইরে বের হতে পারে না সরলা। নিজের যৌবনকে কোন্ নারী পর-পুরুষের সামনে মেলে ধরতে পারে? কেউ কেউ হয়তো পারে। নির্লজ্জ বেহায়া এমন নারী সমাজে অল্পবিস্তর আছে। সরলাদের ভাষায় তারা নাঙ ঠাপানি। নারীর নিজস্ব কিছু সম্পদ আছে। সেই সম্পদের গুণেই নারী যুগে যুগে মহিয়সী। মোহময়ী। মাতা। দেবী। ধাত্রী। নারী তার সহজাত লজ্জার কারণে আকর্ষণীয়া কালে কালে।

সকালেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল শ্রীকান্তর। অন্য দিনের মত আজো

ফেরালো খগেন। প্রাপ্য টাকা দিলে না। বললো—কাল বিকালে আসিস। ঘরে চাল বাড়ন্ত। চাল নিয়ে এলে তবে উনুনে হাঁড়ি চড়বে। সরলা পইপই করে বলে দিয়েছে—দেরি করবে না। তবু দেরি হচ্ছে শ্রীকান্তের। যত দেরি হচ্ছে তত মেজাজ চড়ছে সরলার। বাইরে বেরুলে কি মদ্দদের আক্কেল থাকে না ?

শ্রীকান্ত ফিরলো অনেক বেলায়। ক্লান্ত শরীরে দাওয়ায় বসতে না বসতে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের গরল উগরে দিল হুড় হুড় করে।

—মুরোদ নি যার সে বে করে কেন? পেটে পোঁদে দিতে পারবে নে অথচ মাগ পোষার শখ ষোলো আনা। নিমুরোদে মুখপোড়া মিন্‌সের হাতে পড়ে আমার হাড় মাস কালি হলো, সুখের মুখ দেখলুমনি। পেট ভরে ভাত দূরের কথা, ছ'বছরে ন্যাঙটো পোঁদে একটা শাড়ি জুটলোনি। এরই নাম ভাতার! নোকে বলে মিন্‌সে আমার রাজা! থুঃ থুঃ অমন···

ব্যক্তিবিশেষে সহনশীলতার রকমফের হতে পারে কিন্তু তার সীমা নিশ্চয় একটা স্থানে সমাপ্ত হয়। দুপুর গড়িয়ে যেতে বসলো। অনেকক্ষণ থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছে ছেলেটা। ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। রাগের বশে তার পিঠে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল সরলা।

—ঢ্যাম্‌না, তোলাউঠো শত্তুর। মর মর। এখুনি মর। গাঙের চড়ায় যা। আমার হাড়ে বাতাস নাগুক।

বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ত্রীকে দেখছে শ্রীকান্ত। বোঝার চেষ্টা করছে সরলার ক্ষোভটা কোথায়।

সরলা ক্ষুব্ধ হলেও শ্রীকান্ত নিরুপায়। খগেনের মন টলাতে অনেক চেষ্টা করেছে। ফল কিছু হয়নি। প্রাপ্য টাকা দেয়নি, উল্টে অনেক অকথা কুকথা শুনিয়েছে। গত মরশুমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এ মরশুমে জাল নৌকা দাদন দেবে। এতদিন সেই আশায় অনেক পরিকল্পনা করেছে। রঙীন স্বপ্ন দেখেছে। স্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মুদীর দোকানে ধার খেয়েছে। গদাখালির বিষ্টু দাস উপযাচক হয়ে শ্রীকান্তকে জাল নৌকা দাদন দিতে চেয়েছিল। খগেনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্টুকে না

করে দিয়েছে গত সপ্তাহে। আজ খগেন বললো কিনা দিতে পারবো না। সব বিলি হয়ে গেছে। উল্টে জ্ঞান দিয়েছে—বিষ্টুর কাছে যা না, পেয়ে যাবি। এরপর কোন মানুষের মাথার ঠিক থাকে।

শ্রীকান্তের অনেক দিনের স্বপ্ন কাত্তিকের মত জাল নৌকা দাদন নিয়ে স্বাধীনভাবে নদীতে জাল পাতবে। হাজার হাজার চকচকে ইলিশ ধরা পড়বে তার জালে। ইলিশ তো নয়। পাতালপুরীর রাজকন্যা। সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভাঙলে ছুটে আসবে জালের ফাঁদে। ফড়ে আর পাজারী মেয়েদের ভীড় লেগে যাবে নৌকা ঘিরে। লোভী দৃষ্টিতে দেখবে জলকন্যাদের। কাত্তিকও অনেক আশা ভরসা দিয়েছিল। খগেন জানাকে বলে কয়ে রাজি করিয়েছিল। আজ কার্ত্তিকের সামনেই খগেন সাফ বলে দিয়েছে হবে না।

—লেশ্চয় পেছনে প্যাঁড়া নেগেছে।

কার্ত্তিকের এই কথায় কেমন করে শান্ত হয় শ্রীকান্তের মন। প্রচণ্ড ঝাপটায় তছনছ হয়ে গেছে সযত্নে সাজানো বাগান। এতদিনের লালিত আশা আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যুতে ভেতরটা জ্বলছে দাউ দাউ করে। সরলার মুখ শুনে দ্বিগুণ জ্বলে উঠলো।

—বউ চেল্লাসনি। মেজাজ ঠিক নি বলছি।

সরলারও মেজাজ স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। সকাল থেকে অনেক ঝড় ঝাপটা, অনেক অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে তার বোধের ওপর। ভেতরে ভেতরে সেও ফার্নেসের মত ক্ষোভের আগুনে গনগন করে জ্বলছে। ভেতরের প্রতিবাদী সত্তা প্রবল বিক্রমে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—তা থাকবে কেন?

প্রচণ্ড শ্লেষ উগরে দিল সরলা।

—মাগের যৈবন পাঁচজনে দেখুক তাতে সুনাম বাড়বে। অমন মিন্‌সেকে ছিঃ। মাগের পেটে খোরাক দিতে পারবে নে। পোঁদে ট্যানা দিতে পারবে নে তার আবার কুলোপনা চক্কর। ফোঁসফোঁসানি।

খানিক দম নিয়ে পুনরায় বললো —

—মেজাজ দেখাচ্ছেন। ওরে আমার মেজাজ রে। রাজা বাদশা তো! মেজাজের কল্‌কেতে তামাক খাচ্ছেন। থুঃ থুঃ অমন মেজাজে! শাড়ির পয়সা জোটে না ঢেম্‌নি নিয়ে ফুর্তি করতে পয়সা আসে কোত্থেকে? মদ গিলতে পয়সার অভাব হয় না?

শ্রীকান্ত মাঝে মাঝে দামোদরের বিধবা বোনটার ঘরে যায়। ভাল তাড়ি বানায় পদ্ম। দু'এক গ্লাস তাড়ি গলায় ঢেলে আনন্দ পায়। মাত্রা বেশি হলে একটু আধটু বেসামাল হয়। তাই নিয়ে খোঁটা! পদ্ম আমার ঢেম্‌নি?

—এ্যাই মাগী, চুপ করবি?

দ্বিগুণ জ্বলে উঠলো সরলা। সেও মনে মনে স্থির করেছে আজ পাল্লা দিয়ে ঝগড়া করবে। বহুদিনের জমা ক্ষোভের হেস্তনেস্ত হোক আজ। কচের মা কিছুক্ষণ আগে শুনিয়ে গেছে শ্রীকান্তকে পদ্মের ঘরে দেখেছে আজ সকালেই।

—কেন চুপ করবো? তোর ভয়ে? ওরে আমার ভাতার রে! ঢেম্‌নির যদি অত পিরিত আমাকে বে করেছিলিস কেন? আমার ভাতার জুটতো নি?

—তোর বাপের ছাদ্দ করতে।

—আমার বাপের ছাদ্দ না তোর বাপের ছাদ্দ রে মুখপোড়া ঢ্যাম্‌না।

এমনিতে শ্রীকান্তের ভেতরে গনগনে আগুনের জিভ লকলক করছে! সরলার গালাগালে জ্বলন্ত চুল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটলো।

—আমার মরা বাপকে নিয়ে···তবে রে মাগী। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। আজ তোকে খুন করে জেলে যাবো। টুঁটি কেটে দোবো শালী।

ছুটে গিয়ে কয়েক ঘা কিল ঘুষি চালিয়ে দিল সরলার বুক পিঠ লক্ষ্য করে। কয়েকটা পড়লো মুখে। ছেলেটা বসেছিল মায়ের পাশে। ভয়ে সে চিল চিৎকার শুরু করলো।

আচমকা আক্রমণে প্রথমটা হতচকিত হয়ে পড়লো সরলা। পরক্ষণেই সামলে নিল। শুরু করলো পাল্টা আক্রমণ। দু'হাতে শ্রীকান্তর গলা জড়িয়ে দুম দুম করে কয়েকটা কিল ঘুষি চালিয়ে দিল। রীতিমত রণরঙ্গিনী। আক্রমণের উত্তরে প্রতিআক্রমণ। চুল ধরে টেনে শ্রীকান্তকে শুইয়ে ফেললো রান্নাঘরের মেঝেতে। শুয়ে শুয়েই শ্রীকান্ত লাথি ছুড়লো সরলার বুকে, পেটে। কিছু লাগলো। কিছু ফসকালো। লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলো সপাটে। জড়াজড়ি করে দু'জনে গড়িয়ে পড়লো উঠোনে। হঠাৎ শ্রীকান্ত হাতের কাছে পেয়ে গেল একটা শুকনো নারকেল বাগলো। সেটা দিয়ে এলোপাথাড়ি পিটিয়ে দিল সরলাকে।

মাঝে মধ্যে নানা কারণে এরকম একটু আধটু হয়ে থাকে। কথা বলা বন্ধ থাকে একবেলা। দু'বেলা। তারপর ভাব হয়ে যায়। উভয়ের ক্ষতস্থানে ভালবাসার হাত বুলিয়ে দেয়। প্রতিজ্ঞা করে আর কোনদিন এরকম করবে না। জীবন স্বাভাবিক চলে। আজ একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। সরলা যখন রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় উঠোনের কাদায় নেতিয়ে পড়লো তখন চেতন হলো শ্রীকান্তর। যাঃ, শালী মরে গেল নাকি ! যদি মরে যায়···

কোনদিক না তাকিয়ে ছুটে পালালো বাড়ির বাইরে। ছুট ছুট। একেবারে গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে।

অজানা আশঙ্কা নিয়ে দিন কেটেছে শ্রীকান্তর। যার সাথে দেখা হয়েছে জানতে চেয়েছে—

—বাড়িতে পুলুশ দেখলি ?

তারা অবাক হয়েছে এমন প্রশ্নে। উল্টে জানতে চেয়েছে—

—পুলুশ কেন ?

শ্রীকান্ত কোন উত্তর দেয়নি। বলেছে—এমনি···।

সন্ধ্যার মুখ-আঁধারিতে চোরের মত শিথিল পায়ে বাড়িতে ফিরলো শ্রীকান্ত। তখন সন্ধ্যা তার কালো আঁচলের যবনিকায় ঢেকে দিচ্ছে

বিশ্বচরাচর। বৃষ্টি ঝরছে ঝিম ঝিম করে। সাঁই সাঁই বইছে গিমেল বাতাস।

আগড়ের দরজা ঠেলে দেখলো মাচার নিচে জ্বলছে কেরোসিন লম্ফ। মেঝেতে চ্যাটাই পেতে শুয়ে আছে সরলা। বুকের কাছে লেপটে আছে ছেলে। সরলার বিপরীতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলো শ্রীকান্ত।

তুপুর থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

অবিরাম ঝরছে।

ভবতারণের রেডিওতে বলেছে সাগরে নিম্নচাপ হয়েছে। রাতের দিকে ঝড় বৃষ্টি বাড়বে।

এখন ইলিশের মরশুম।

রাতের জোয়ারে নৌকায় যাবে শ্রীকান্ত।

নীরবে বসে আছে শ্রীকান্ত।

আকাশ বিত্যুতের আলোয় দেখছে সরলাকে। এ যেন তিন বছরের বিবাহিত স্ত্রী নয়। অন্য কোন নারী। যার সীমানায় পর পুরুষ হিসাবে যাবার অধিকার নেই।

পাশ ফিরে শুয়ে আছে সরলা। পাথরের মূর্তি যেন। অনড়। কিছুক্ষণ পূর্বে দমকা বাতাসে নিভে গেছে লম্ফটা।

অবাঞ্ছিতের মত বসে আছে শ্রীকান্ত।

চল্‌কে ওঠা ক্রোধের পর অনুশোচনার আঘাতে বিধ্বস্ত হচ্ছে তার মেঠো হৃদয়। হাজার চিন্তার দাপাদাপি মনের জানালায়। তিন বছর দাম্পত্য জীবনের মধুর স্মৃতিরা ছায়া আঁকছে মনের মুকুরে।

—বউ। ও বউ।

অবশেষে ডাকলো শ্রীকান্ত।

না। কোন প্রত্যুত্তর মিললো না অন্য প্রান্ত থেকে। সরলা যেমন শুয়েছিল তেমনি থাকলো। শরীরে প্রাণ আছি কি বোঝা যাচ্ছে না। অনেক পরে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুকের খাঁচা থেকে।

শ্রীকান্ত পুনরায় ডাকলো।

—দ্যাখ বউ। আমি রাগ করিনি। আগে কথা বলছি। আমার অন্যায় হয়েছে।

সরলা নিরুত্তর।

—তুই মেরে নে আমাকে। শোধ বোধ হোক।

সরলা নিরুত্তর।

—আর কক্ষনো তোকে মারবুনি। দুগ্‌গা ঠাকুরের দিব্যি।

সরলা নিরুত্তর।

—আমাকে খেতে দিবিনি? সকাল থেকে কিছু খাইনি। খুব ক্ষিদে পেয়েছে। এক গ্লাস জল দে। তেষ্টায় মরে যাচ্ছি।

পাষাণ প্রতিমায় স্পন্দন জাগলো না।

—বউ।

নিচু হয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলো সরলাকে।

সেদিনের সেই কিশোরী মেয়েটা। ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি পরে, মাথায় ঘোমটা টেনে, ভাসা ভাসা ডাগর চোখ আর গোলাপ কুঁড়ি ফুটে ওঠার পূর্বের পবিত্রতা নিয়ে এসেছিল শ্রীকান্তের জীবনে।

॥ ২ ॥

শ্রীকান্ত কার্ত্তিকের নৌকার দাঁড়ি। দাঁড় টানে। নৌকার মালিক অবশ্য খগেন জানা। দাদন নিয়েছে কার্ত্তিক। নিজেই হাল ধরে। মাঝি। ভাল মাঝি বলে নামডাক আছে তার। ঝড় তুফানে সবাই যখন আতঙ্কিত, চিন্তিত; গাঙের রাক্ষসী রূপ দেখে পরাজয় স্বীকার করে, রাম নাম জপে, কার্ত্তিক তখন নিঃশঙ্ক। নির্বিকার। শিরাওঠা শক্ত হাতে হাল ধরে নৌকাকে সোজা রাখে।

ভরাবর্ষায়। ঝোড়োরাতে। গাঙের বুক যখন উথাল-পাতাল। গেরুয়া জলের রক্তখাকী ঢেউগুলো যখন রাক্ষসীর মত প্রচণ্ড আক্রোশে আছড়ে

পড়ে, আড়বাঁধির ভিত তখন থর থর করে কাঁপে। অভিজ্ঞ মাঝিরাও যখন হাল ধরে না, কার্ত্তিক তখন বেপরোয়া। দাঁড়িদের বলে—দাঁড় ফ্যাল।

মা গঙ্গা আর বদরপীরের দোহাই দিয়ে মাতাল নদীর বুকে নৌকা ভাসিয়ে দেয়। কার্ত্তিক হালে থাকলেও দাঁড়িদের বুক কাঁপে। এই বুঝি ঘটলো কোন অঘটন। প্রকৃতির কাছে মানুষ অসহায়। মোচার খোলার মত বিক্ষুব্ধ উন্মাদ জলে হারিয়ে যেতে পারে নৌকাটা। ওদের আতঙ্কের কথা শুনলে শব্দ করে হাসে কার্ত্তিক।

—তোরা মরদ না বিল্লি। মরতে তো হবে একদিন। চল না সবাই একসাথে মরি।

বোদ্ধা দার্শনিকের মত মুখ করে বলে—

—আরে বাবা, ভগবান যদি কপালে মরণ নিকে রাখে তাহলে আটকাবি কেমন করে?

দাঁড়িরা প্রাণভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। দাঁড়ের ছন্দ ব্যাহত হয়। কার্ত্তিক তখন মনের আনন্দে গান ধরে। ভয়ঙ্কর সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে সে অবলীলায় গান গাইতে পারে। আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ। বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা মেলে না।

দাঁড়িরা নৌকার খোলে রাখা জাল ছেড়ে দেয় জলে। ওপরে ভাসে মোটা মোটা ভাল্‌কো বাঁশের 'চোঙা' অথবা প্লাস্টিকের 'বল'। জোয়ারের স্রোতে ভেসে চলে নৌকা। ভাটার শুরুতে পুনরায় জাল টেনে তুলে নেয় নৌকায়। জালে জড়িয়ে উঠে আসে পাতালের রাজকন্যারা। চকচকে চোখ ঝলসানো ইলিশ। শূন্যে কয়েকবার ব্যর্থ আস্ফালন করে স্থির হয়ে যায় নৌকার পাটাতনে। চিরনিদ্রায় এলিয়ে দেয় রুপালী শরীর।

ইলিশমারা কালো কালো মানুষদের কালো কালো চোখ চকচকিয়ে ওঠে ইলিশ দেখে। পাতালপুরীর রুপালী রাজকন্যারা এককালে তাদের ঘর দিয়েছে। বর দিয়েছে। সুখ দিয়েছে। সমৃদ্ধি দিয়েছে। মর্যাদা দিয়েছে। সম্মান দিয়েছে।

এখন যুগ পাল্টেছে। ইলিশ দেখলে ইলিশমারাদের চোখ উজ্জ্বল হয় না। দুঃখই বাড়ে। বুকের গহন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে পাঁজর ভাঙা হাহাকার। আশায় ভেজা চোখের আড়ালে কান্না চলকায়। সিংহ-ভাগ চলে যায় মহাজনের ঘরে অথবা আড়তে। নিরুপায় ইলিশমারারা। আশ্চর্য একটা গ্যাঁড়াকল তাদের শ্রমের ফসল হাতিয়ে নেয়।

এককালে ইলিশ, ইলিশমারাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। এখন চোখে জল ঝরাচ্ছে। জীবনকে বাজি রেখে, মৃত্যুর সাথে দ্বৈত লড়াইয়ে জয়লাভ করে রাক্ষসী গাঙের বুক থেকে ছিনিয়ে আনছে যে ইলিশ তা নৌকা আর জালের ভাড়া বাবদ বেশি অংশটা চলে যাচ্ছে মহাজনের কালো হাতে। ওই হাতে কোন ফাঁকফোঁকর নেই যে গলে কিছু বেরিয়ে আসবে। সামান্য কিছু অংশ যা কিনা ছিটেফোঁটার নামান্তর, তাই নিয়ে খুশি থাকতে হয় ওদের। মহাজন বিনাশ্রমে শুধু জাল নৌকা ভাড়া খাটিয়ে বেশি অংশ ছিনতাই করে নিচ্ছে প্রকাশ্যে। নিজস্ব আইনের আড়ালে।

ইলিশমারারা ভাবে। ভাবনার স্বাধীনতা এখনো আছে তাই ভাবে। ভাবে নিজেদের যদি জাল নৌকা থাকতো। তাহলে সব ইলিশের মালিক তারাই। নিজের যদি সব ইলিশ হতো তাহলে বউয়ের পাছাপেড়ে শাড়ি হতো। নাকছাবি হতো। বাঁধা দেওয়া কাঁসার থালা ফিরে আসতো ঘরে। দুঃখের ভাঙা ঘরে আসতো চাঁদের আলো। শিকেয় ঝুলতো নোনা ইলিশের হাঁড়ি।

পূর্বপুরুষরা জাল নৌকা হারিয়ে যে মহাজনী ফাঁসে বাঁধা পড়েছিল বহুকাল পূর্বে, আজো সর্বনাশা সেই ফাঁস থেকে মুক্তি পায়নি তাদের উত্তরপুরুষরা। কার্ত্তিক হাবুল নবীন শ্রীকান্ত কালী মোহন বাদল মৈনুদ্দিনরা। জাল নৌকার ভাড়া বাবদ আটভাগের চারভাগ দিতে হয় মহাজনকে। তিন দাঁড়ি এক মাঝির এক-এক ভাগ। এটা অলিখিত আইন। মহাজনদের তৈরি করা সংবিধান। আইন মানলেই জাল নৌকা দাদন পাওয়া যাবে। নাহলে নয়।

পূর্বে ভাগীরথী ছিল উর্বরা। প্রচুর ইলিশ ছিল তার বুকের গহনে। মহাজনদের প্রাপ্য মিটিয়েও থাকতো অনেক। ভাগীরথী এখন বন্ধ্যা। ইলিশের আকাল নোনাজলে। মহাজনের প্রাপ্য মিটিয়ে ইলিশমারাদের পারিবারিক ন্যূনতম প্রয়োজন মেটে না। বাধ্য হয়ে জাল নৌকা ছেড়েছে অনেকে। পেশা ত্যাগ করে শহরে আশ্রয় নিয়েছে। বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছে। যে ক'জন এখনো জাল নৌকার মায়ায়, মা গঙ্গার আকর্ষণে গাঙে নৌকা নামায় তাদের পরিবার উপোস থাকে বছরের অনেকগুলো দিন। জেলেপাড়ায় উপোসের প্রতিযোগিতা চলে। জেলে বউয়ের পরনে শাড়ি জোটে না। সন্তানরা অসুখে পথ্য পায় না। বর্ষায় ঘুমাতে পারে না।

মাতাল রাতে উপোস থাকে জেলেপাড়ার মানুষরা। জেলে বউয়ের চাপা কান্না প্রতিধ্বনিত হয় আদাড়ে বাদাড়ে। তখন মহাজনের রান্নাঘরের জানলা টপকে ভাজা ইলিশের গন্ধ জেলেপাড়ার ভিজে বাতাস মদির করে তোলে। বুক ভরে দম নিয়ে ইলিশমারারা ভাবে এটাই অদৃষ্ট। গালাগাল দেয় নিজেকে। ভাগ্যকে। ঈশ্বরকে। মহাজনকে। সরকারকে।

॥ ৩ ॥

ভাদ্রের ঝিমঝিমে বৃষ্টি। রাতগহিনে নৌকায় যাচ্ছে কার্ত্তিক শ্রীকান্ত হাবুল। হয়তো বৃষ্টির রাত বলে এলো না নবীন। অন্ধকার রাতের বুকে পা রেখে ওরা এসে দাঁড়ালো নদীর বাঁধে। উচ্ছলা যুবতীর মত কলকলিয়ে ছুটে চলেছে নদী। শত হাসির ঝর্নাধারায় দু'কূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুটেছে দক্ষিণমুখি। সাগরের দিকে। দয়িতের বিশাল বক্ষে ঝাঁপ দিতে চলেছে তরঙ্গিণী তটিনী ভাগীরথী। দু'কূল নিকষ কালো আঁধারে ঢাকা। দূরে পোর্ট কমিশনের বয়ার লাল আলোটা জ্বলছে দপদপ করে। অন্ধকার বিক্ষুব্ধ রাতে ওই রক্তচক্ষু যেন কোন্ সর্বনাশের সংকেত। অনেক

দূরে বিড়লাপুর চটকল। জেটির কয়েকটা আলো দূর আকাশের তারার মত টিপ টিপ করছে। তিনফটক পুলের ফাঁক দিয়ে প্রচণ্ড বেগে জলের স্রোত সাপটে পড়ছে ভাটা নদীর বুকে। এতদূর থেকেও শোনা যাচ্ছে সে শব্দ। বাদলার রাতে পুঁটে মাঝির শ্মশানে কারা শবদাহ করছে। চিতার আগুন নিভু নিভু। হরিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

বড়সড় একটা সোঁদাল গাছের শিকড়ে বাঁধা ছিল নৌকা। ওরা তিনজন গিয়ে দাঁড়ালো নৌকার কাছে। জলের কিনারে। জলের শব্দ শুনে কার্ত্তিক বললো—

—জুয়ার নাগতে দেরি নি। লে ওঠ।

বৃষ্টির সাথে হিমেল বাতাস ছুটে আসছে হুহু করে।

ভিজে শরীরে শীতের পরশ। কোমরের গামছায় শরীর ঢেকে নৌকায় চড়লো শ্রীকান্ত হাবুল। ঠেলে নৌকাকে জলে ভাসিয়ে শেষে লাফিয়ে উঠলো কার্ত্তিক।

হোগলার ছাউনির নিচে কে যেন শুয়ে আছে। হাবুল বললো—

—কেরে? নবে?

নবীনই শুয়ে ছিল। পাল্টা প্রশ্ন করলো সে—জুয়ার নেগেছে?

—তুই শালা এত অগ্রে এলি যে? লতুন মাগ ছেড়ে তো এসতে চাসনি।

নবীন উঠে বসে হাই তুললো।

—আর বলিস কেন। শালা সাঁঝব্যালায় একপাল ছ্যানাপোনা নিয়ে বড় শালী এসে হাজির। একটা তো ঘর, শোবে কুথায়? বর্ষা-বাদলের দিন চান্দিকে কাদা কেচড়। বউ বললে—এগ্‌গে গিয়ে লৈকো-তেই শোও। বোঝ ঠ্যালা। জাড়ে ভাতার মরুক, বোনের যেন কষ্ট না হয়। এর নাম পরিবার। কী আর করি বল। মাগের দিদি বলে কথা। রান্নাঘরের কুটুম। শেল ভেজা হয়ে এলুম নৈকোতে। এমন জানলে কোন শালা মাইরি বে করতুক।

সবাই হাসলো নবীনের বলার ভঙ্গিতে। কার্ত্তিক বললো—

—তুই একটা গাছ গাড়োল। এমন বর্ষার রাতটা লষ্ট করলি। আমি ভেবেছিনু লতুন মাগ ছেড়ে আজ লৈকোয় এসবি নি।

কাঁচা খিস্তি দিয়ে কাত্তিক পুনরায় বললো—

—আহাঃ বর্ষার রাতে বড় সুখ দেয় ওরা। বড় সুখ দেয়।

পুনরায় সবাই হাসলো। নবীনও হাসলো। ট্যাঁক থেকে প্লাস্টিকের মোড়ক বের করে একটা বিড়ি বাড়িয়ে ধরলো কাত্তিকের দিকে।

—ল্যাও খুড়ো, কোলকেতার বিরি একটা খেয়ে ছাখো। খুব মিঠে। সিগ্রেটের প্যানা।

—গুল দিস্‌নি নবে। কোলকেতার বিরি পেলি কোথা? বললো শ্রীকান্ত।

—হুঁ হঁ বাবা। পেলুম। লাখটাকা পাবার ভঙ্গিতে নবীন বললো তুমি বুঝবে কি গর্দভ। শালী এনেছ্যাল। খাস কোলকেতার মাল। খেয়ে ছাখ্। ভারি মিঠে কোলকেতার জিনুস। ছকু পালের বিরি কলচাপ। টানলে ধোঁয়া এ্যাসে না। জোরে একটা টান দিয়ে নবীন পুনরায় বললো—

—আঃ ই-যেন বিল্লাপুরের কলের চোঙার প্যানা। হুস্ হুস্ করে ধোঁয়া এসছে।

কাত্তিক বিড়িতে আগুন দিয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো—ফৌতি করেছে। ইলিশ লেশ্চয় বেশি পড়বে। জয়বাবা বদরপীর মুখ তুলে চাও। জয় মা গঙ্গা। একবস্তা ইলিশ পাইয়ে দে। জোড়া পাঁঠা দোব।

আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করলো—বদর বদর।

সবাই হাঁকলো বদর বদর। এটাই নিয়ম, একজন বললে সবাইকে বলতে হয়।

হাবুল নবীন শ্রীকান্ত বসলো দাঁড়ে। হালে দাঁড়ালো কাত্তিক। অন্ধকার রাতের বুক চিরে নৌকা ছুটলো মাঝ গাঙে।

মাতাল গাঙ মাতাল করে ইলিশমারাদের। ঘরে দুঃখ আছে। কষ্ট আছে।

হতাশা আছে। রোগ শোক আছে। আছে স্ত্রী পুত্র পরিবার। দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি কুরে কুরে খায় ওদের। কিন্তু গাঙে নৌকা ভাসালে সব কিছু বিস্মৃত হয়। তখন কারো পিতা নয়। পুত্র নয়। স্বামী নয়। আত্মীয় নয়। ওরা তখন ইলিশমারা। মন বিচরণ করে গহিন জলে। আশার নন্দন কাননে। ঈশ্বরী বাগানে নিষিদ্ধ ফলের সন্ধানে।

খুশির লাগাম ধরতে গান ধরলো কার্ত্তিক। মনের বাগানে খুশির বাতাস লাগলে এমনি গান গায়। গান গাইলেই সঙ্গীরা বুঝতে পারে ওর মনের জানলায় ঝাপটাচ্ছে খুশির হাওয়া।

এককালে শখের যাত্রাদলে সখীর গান গাইতো। গলা ভাল। সুযোগ পেলে গলা ছেড়ে গান ধরে। গভীর রাতে, মাঝ নদীতে নৌকার ওপর ছাড়া এমন সুযোগ কোথায় মিলবে? মনের খুশিতে যেমন গান গায়, ক্ষোভেও গান গায়। তবে সে গানের কথা ও সুর পৃথক পৃথক। কিছু গান শেখা। যখন যাত্রাদলে ছিল। কিছু গান সে চলতে চলতে তৈরি করে। হয়তো সেগুলো আদপে গানই নয়। তবুও সুরে ধরার চেষ্টা করে। বাড়তি সুবিধা পায় তাতে। গানেতেই গালাগাল দেয় মহাজনকে। তার উর্ধ্বতন কয়েক প্রজন্মকে নামিয়ে আনে পৃথিবীতে। শ্লীল অশ্লীল গানে ময়লাজলের বন্যা বইয়ে দেয়।

মাতাল রাতে সবাই যখন নিশ্চিন্তে দরজা এঁটে ঘরে থাকে, ইলিশ-মারারা তখন গাঙে নৌকা ভাসায়। শহরের মানুষরা যখন ঘুমের দেশে স্বপ্ন দেখে, ওরা তখন মৃত্যুর সাথে লুকোচুরি খেলে।

আনন্দে নাচে।

গান গায়।

উল্লাস করে।

এ রকম পাগলা রাতেই ইলিশ বেশি পড়ে। ইল্‌শেগুঁড়ির নাচ দেখতে অন্ধ হয়ে ছোটে। মাতাল গাঙ ইলিশদের মাতাল করে। ছুটে এসে মাথা দেয় ইলিশমারাদের জালের ফাঁদে। হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে আত্মসমর্পণ করে জল্লাদের হাড়িকাঠে।

ট্যালমাটাল রাতেই ইলিশমারাদের ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হয়। জাল নৌকার ভাড়া দিয়েও খানিকটা থাকে। কিন্তু এমন মাতাল রাত, মাতাল গাঙ বছরে দু একবারই মাত্র আসে, বাকি সময় থাকে রিক্ত। তাই বরুণদেব, পবনদেবের কাছে প্রার্থনা করে এমন দিন বার বার আসুক। ধরিত্রী পাগল হোক। নদী মাতাল হোক। ওলোট পালোট হয়ে যাক সবকিছু। তছনছ হয়ে যাক বিশ্বসংসার। যার যা যায় যাক। তাদের তো হারাবার কিছু নেই।

মরশুমের এই সময় ইলিশমারারা স্ত্রীর শাড়ি কেনে। সরু চাল কেনে। স্ত্রীকে খুশি করতে নকল সোনার গয়না করে দেয়। জেলে বউরা আলতা কেনে। গন্ধ তেল কেনে। বাঁধা দেওয়া থালা ঘটি বাটি, রেশন কার্ড ফিরিয়ে আনে। মেলা থেকে আয়না চিরুনি, পুঁতির মালা কেনে। কেনে লক্ষ্মীর পট। মরদকে লুকিয়ে এক কৌটো স্নোও কেনে। একান্ত নিজের সময় কালো মুখে স্নো মেখে অবাক করে দেয় স্বামীকে।

কার্ত্তিকের গান শুনে বিস্মিত হলো নবীন।

—খুড়ো আজ যে খুব ফুর্ত্তি। ব্যাপার কী। খুড়ি খুব আদর করেছে বুঝি?

—ধ্যাৎ। তোর খুড়ির সঙ্গে তিনদিন বাক্যি বন্ধ।

—কেন? কেন? নবীনের প্রশ্নে বিস্ময়।

—বাপের ঘরে যাবে বলেছ্যাল। যেতে দিইনি। মুখ তেলো হাঁড়ি।

—তবে আজ এত ফুর্ত্তি?

—ফুর্ত্তি হবেনি। আজ আকাশ আর গাঙ আক্ষসের মতুন নাচতিছে। পিরীতের লাগরী এস্‌বে যে।

—এতে ফুর্ত্তির কী হলো?

—আজ অনেক ইলিশ পড়বে।

—তাতে আমাদের কী।

অন্ধকারে বিচিত্র শব্দ করলো হাবুল। সেটা বিদ্রূপ প্রশংসা আনন্দ

অথবা উল্লাস বুঝতে পারলো না কার্ত্তিক।

—দূর, বেশি পড়লে আমাদের কী। যে কলু সে কলুই থাকবো।

—তা ঠিক। কার্ত্তিক বললো। কিন্তু একসাথে বেশি ইলিশ দেখলে বুক ভরে ওঠে আনন্দে। কতদিন একসাথে অনেক ইলিশ দেখিনি। পাই না-পাই দেখেও সুখ।

—দেখে কী হবে খুড়ো। পেট ভরবে?

— না। তা ভরবে নি। তবুও অনেক দেখলে কচি বউয়ের মতুন বুকে শুইয়ে আদর করতে ইচ্ছা হয়।

—পেটে ক্ষিদে থাকলে কিছুতেই সুখ নেই খুড়ো! কচি বউও তেতো লাগবে।

হাবুলের কথাগুলো বড় সত্যি। পেট ভরা থাকলে সব ভাল। কার্ত্তিক বলার মত কথা খুঁজে পেল না। চুপ করে থাকলো। হাবুল বললেও কথাটা ওর নয়। সব ইলিশমারার। পরের গোলামিতে সুখ নেই! অন্যের নৌকার হাল টেনে, নিজে অভুক্ত থেকে কতদিন মহাজনকে ধনী করবে? প্রশ্ন নিজের কাছেই। শ্রমের সিংহভাগ মহাজনের ঘরে দিয়ে বাঁচবো কি করে? কতদিন নিজেকে, পরিবারকে অনাহারে রেখে মহাজনের সুখ সমৃদ্ধির মিনার গড়ে দেবো।

মহাজনী এ ফাঁস ছিন্ন করা যাবে না কোন দিন?

সবাই নীরব। পুনরায় ফোঁস করে উঠলো হাবুল।

—আমরা রাতভর ভিজে ভিজে মরবো, মজা লুটবে শালা মুল্লুকে। গউন রাতে আমরা মরার সঙ্গে নড়াই করছি। সে শালা হারামির বাচ্ছা দোজপক্ষের মাগ কোলে নিয়ে ঘুমুচ্ছে। মরলুম কি বাঁচলুম, হাঙরে খেলো কি কুমিরে খেলো একবারও দেখছে না। সকালে ভাগের ভাগ নেবে। বেশি পড়লে শালা বোনাইদের জন্যেও বেশি নেবে। তেবু চোর বলবে। নেমকহারাম বলবে। শালা পিমড়ের পোঁদ চুষে খেকো চামার।

ক্ষোভের গরল উগরে দিল হুড় হুড় করে।

—খুড়ো, পরের জমি চষে কতদিন বাঁচবো?

অন্ধকারে হাবুলকে স্পষ্ট দেখতে পেল না কার্ত্তিক। কিন্তু হাবুলের কথা তাকে ভাবালো। সত্যি এমনি করে কতদিন বাঁচবো! মাঝে মাঝে কার্ত্তিকের মনে উদয় হয়েছে এমন প্রশ্ন। বাঁচার একমাত্র উপায় নিজে-দের জাল নৌকা করা। নিজের জাল নৌকার কথা ভাবলে বুকের মধ্যে ধক ধক করে। বুকের নীল অন্ধকারে আশার পাখিটা কতকাল থেকে ডানা ঝাপটাচ্ছে মুক্তির জন্য। স্পর্শকাতর একটা যন্ত্রণা চিন্‌চিন্‌ করছে বহুযুগ থেকে।

শ্রীকান্ত শুনছে ওদের কথা। আসলে কথাগুলো কোন ব্যক্তির নয়। একটা গোষ্ঠীর। যার সদস্য শ্রীকান্ত নিজেও। নতুন কিছু ভাবতে হবে। কী সেই ভাবনা! নিজেদের জাল নৌকা চাই।

নিজের জাল নৌকা! স্বাধীনভাবে গাঙে জাল পাতা! আহা! সে তো মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসা। এমন দিন কি সত্যি আসবে! যদি আসে…

হঠাৎ শ্রীকান্তর মনের পর্দায় ভেসে উঠলো সরলার রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত মুখ। ছিঃ ছিঃ! নিজেকে ধিক্কার জানালো। কতটুকু চাহিদা সরলার। রাজ্য নয়। রাজবাড়ি নয়। গাড়ি নয়, গয়না নয়, শুধু একটা সাধারণ শাড়ি। নারী হয়ে সভ্য সমাজের কাছে নারীর মর্যাদা রাখতে চেয়েছে, চেয়েছে নারীর প্রধান সম্পদ লজ্জা বাঁচাতে।

না। না। এখন ওকথা ভাবতে চায় না শ্রীকান্ত। ভুলে যেতে চায় দুপুরের ঘটনাগুলো। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে। পৃথিবীর নিষ্ঠুর-তম মানুষের একজন মনে হচ্ছে নিজেকে!

শ্রীকান্তর বুকের গহিনে খাঁ খাঁ শূন্যতায় ঝোড়ো বাতাস আছড়ে পড়ছে। একসময় তার বাপের জাল নৌকা ছিল। ঘরের কানাচে ভাঙা নোঙর একটা রাখা আছে এখনো। ভাঙা দাঁড় দুটো আছে মুরগির খোঁয়াড়ের চালে।

বাল্যকালের স্মৃতি স্পষ্ট নয়। তবুও মনে আছে তার বাপ 'শুকোয়'

যেত। 'শেলেয়' যেত। ইলিশের মরশুমে ফড়ে আর পাজারী মেয়েদের বিক্রি করে সেরা ইলিশটা নিয়ে ঘরে ফিরতো। মুখে থাকতো বিশ্বজয়ের হাসি। তখন ইলিশ খেতে ইচ্ছা করতো না। বরং 'শুকো' ভাল লাগতো। ঠাকুমা সাধাসাধি করে বলতো—

—খেয়ে নে ভাই। যত ইলিশ খাবি গতরে তত অক্ত হবে।

গল্প শোনাতো—ইলিশের তেল খেয়ে ঠাকুমার ঠাকুরদা এত শক্তিমান হয়েছিল—শুকোয় গিয়ে সুন্দরবন থেকে জীবন্ত পেল্লায় কুমির ধরে এনে পুকুরে ছেড়েছিল। আর সেই কুমির দেখতে দশ গাঁয়ের মানুষ এসেছিল সেদিন।

ইলিশের কল্যাণে কত সুখ ছিল তখন। মায়ের অনেক গয়না ছিল। নকল নয়, আসল সোনার। মা দুর্গার মত দেখতে ছিল মাকে। তখন বাপের মুখে ইলিশমারা জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনে শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত চলকাতো। মনে হতো কবে যে বড় হবো। অশান্ত ওই জীবনে প্রবেশ করার জন্য মন আঁকুপাঁকু করতো। ভগবানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল কেন তাড়াতাড়ি বড় করে দিচ্ছে না।

অন্ধকার রাত। মাতাল গাঙ। উত্তাল ঢেউ ইশারায় ডাকতো শ্রীকান্তকে। ভয়াল সুন্দর সুন্দরবন তাকে বার বার জাগিয়ে দিত ঘুমের মধ্যে। যেখানে কোনদিন মানুষের পদস্পর্শে শুকনো পাতায় মর্মরধ্বনি তোলেনি। চির অনাঘ্রাত সেই কুমারী বক্ষে একমাত্র মানুষ সে। সে কল্পনাও ছিল সুখের। আজ মাতাল নদীর বুকে টালমাটাল নৌকার পাটাতনে বসে শ্রীকান্ত ভাবছে সেই স্বপ্নের দিনগুলো কেন ফিরে আসে না।

এখন কী যে হলো দেশের। আকাল লেগেছে, সর্বত্র আকাল। চালে আকাল। ডালে আকাল। আকাল নুন তেল কাপড়ে। আকাল সব কিছুতে। ফরাক্কায় বাঁধ বাঁধলো সরকার। গাঙে পলি জমলো। ইলিশ কমলো। ইলিশমারাদের ঘর ভাঙলো। ঘরের চাল খসলো। উদরে সৃষ্টি হলো বিশাল শূন্যতা।

এখন ওরা ইলিশমারা নয়। মহাজনের শ্রমদাস। আটভাগের এক ভাগ পেয়ে উদরের শূন্যতা ভরাট হলো না। পরিবার স্বজনরা দাঁড়ালো খাদ্যের সারিতে। জেলে বউয়ের অঙ্গ হলো অনাবৃত। পানের রঙে রাঙলো না তাদের পুরুষ্ট ঠোঁট দুটো। চলকে উঠলো না ঝিলিক লাগানো হাসি।

ভিজে শাড়ি শরীরে শুকালো। ঘরের ছাউনি মেরামত হলো না। জ্যোৎস্না রৌদ্র আর বর্ষার ছাট অবাধ প্রবেশাধিকার পেল ইলিশ-মারাদের ঘরে ঘরে।

॥ ৪ ॥

জোয়ার আসছে।

অন্ধকার নদীর বুকে জল-কলধ্বনি আগিয়ে আসছে। নারীর প্রথম যৌবন আসা যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না। নারী নিজে হয়তো বৃন্তের গভীরে শুনতে পায় আগত যৌবনের পদধ্বনি। তেমনি রাতের অন্ধকারে জোয়ার আসা দেখা যায় না। শব্দ শোনা যায়। নৌকার শরীরে যখন আছড়ে পড়ে প্রবল ঢেউয়ের ছোবল। টালমাটাল হয় নৌকা। তখন বোঝা যায় জোয়ার এলো।

জোয়ারের আগমনে সবাই উল্লসিত। অন্য নৌকার মানুষের হল্লা শোনা যাচ্ছে। জোয়ার যৌবনের মত চিরনতুন। চিরসুন্দর।

জোয়ার আসার পূর্বেই হাবুল নবীন শ্রীকান্ত নদীর আড়াআড়ি জাল পেতে রেখেছে। মোটা মোটা বাঁশের চোঙা ভাসছে ওপরে। জাল ডুবে গেছে জলের গভীরে। ইলিশের রাজত্বে। জালের একপ্রান্ত বাঁধা আছে নৌকার সাথে।

জালে টান লাগলো।

চমকে উঠলো নৌকার শরীর।

জোয়ার এলো।

পলিগোলা গেরুয়া জল সাগরের দিক থেকে ছুটে আসছে হু হু করে। কে জানে ওই ঘোলা জলের সাথে ছুটে আসছে কত রুপালী চাঁদ-ভাঙা ইলিশ। ইলিশমারাদের স্বপ্নের রানী ইলিশ। অতল জলের সেই রাজকন্যারা।

—দরিয়ার পাঁচ পীর—বদর বদর।

আঁধার গাঙের বুক চিরে অনেক কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো—বদর বদর।

স্রোতের টানে জালের সাথে নৌকাও আগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কার্ত্তিক। দৃষ্টি তার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া নদীর বাঁকে। আজ ইলিশের আকাশ। ইলিশের গাঙ। ইলিশ বেশি পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ।

আজ যদি অনেক ইলিশ পড়ে। সেই পুরানো অতীত ফিরে আসে। কার্ত্তিক ভাবছে—নিজের যদি জাল নৌকা হয়। তাহলে পুঁটির মাকে গড়িয়ে দেবে সোনার নাকছাবি। পুঁটির মায়ের অনেক দিনের শখ। সেই যেদিন লাল ডুরে শাড়ি পরে, পায়ে আলতা দিয়ে, ঘোমটা মাথায়, কার্ত্তিকের সাথে প্রথম তার বাড়িতে এসেছিল। সুখের এক দুর্বল মুহূর্তে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কার্ত্তিক ভুলে গেলেও পুঁটির মা ভোলেনি। মাঝে মাঝে স্মরণ করায়।

বড় ভাল দেখাবে পুঁটির মাকে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে কার্ত্তিক, পুঁটির মায়ের বয়স অনেক কমে গেছে ছোট একটা নাকছাবিতে। শুধু নাকছাবি নয়। কার্ত্তিকের ইচ্ছা একটা লাল ডুরে শাড়ি দেবে। বিয়ের প্রথমদিন যেমনি পরে এসেছিল। আর দেবে খগেন জানার বউয়ের মত লাল বেলাউজ।

বৃষ্টির গতি কমেছিল, পুনরায় বাড়লো। ছুটে আসছে সাঁই সাঁই ভিজে

বাতাস। সবাই বিপর্যস্ত। কাঁপছে। বিড়ির আগুনে ঠাণ্ডাকে কাবু করা যাচ্ছে না। কার্ত্তিক বললো—

—ছিকান্ত, মাল বাই কর। বিরিতে জাড় যাচ্ছে নে।

নৌকার খোলের মধ্যে 'মাল' অর্থাৎ দেশী চুল্লুর টিন সর্বক্ষণ মজুত থাকে। বর্ষা বাদলার দিনে বিড়ির আগুনে শরীর গরম হয় না। নিশাদল দেওয়া জ্বালানে মদ যখন যেখান দিয়ে যায় জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। বড় আরাম তখন শিরায় শিরায়। শরীরের কোষে কোষে। উত্তাপের ঝলক ছড়িয়ে পড়ে রক্তের কণায়। সব কিছু তখন ফিকে ফিকে। সুনীল প্রশান্তি মগজের অলিতে গলিতে।

শ্রীকান্ত চুল্লুর জেরিক্যান ধরিয়ে দিল কার্ত্তিকের হাতে। মুরুব্বি মানুষ। প্রথম পাবার অধিকারী।

—ন্যাও দাদা। হেব্‌লো আজ কড়া মাল এনেছে। বললো শ্রীকান্ত।

নবীন বললো—হ্যাঁ, এ বেচা খটেলের নয়। ধুমড়ী পদ্মির ফাস্ট কেলাস মাল। ইস্পিশাল।

—তাড়াতাড়ি ন্যাও খুড়ো। জাড়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। বললো হাবুল।

কার্ত্তিকের হাত হয়ে প্লাষ্টিক জেরিক্যানটা সবার হাতে ফিরতে থাকলো। গেলাস ফেলাস নয়। ছিপি খুলে, চোখ বন্ধ করে ঢক্‌ ঢক্‌ করে গলায় ঢেলে দেওয়া। ব্যস। কান ঝাঁ ঝাঁ। শিরার শিরায় উষ্ণ রক্তের ধমকানি।

আপাতত ঠাণ্ডা কিছুক্ষণ শরীরের সীমানায় ঘেঁষবে না।

হঠাৎ হাবুল জানতে চাইলো—

—কতদূর এনু গো খুড়ো ?

অন্ধকার রাতে স্থান নির্ণয় করা মুশকিল। 'বয়ার' লাল আলো দেখে বললো—

—গদাখালি পেইরে এনু মনে হচ্ছে।

বর্ষা বাদলার রাতেও কালীপদ গান গাইছে। হারানো প্রেয়সীর জন্য

উদাসী মনের করুণ আর্তি। বুক ভাঙা হাহাকার।

—কেরে কালী? হেঁকে বললো কার্ত্তিক। রাত গউনে লাগরার জন্যি এত কাঁদন কেন? কোথায় পালালো পিরিতের লাগরী? রসিকতা করলো কার্ত্তিক।

পাশের নৌকা থেকে কালীপদ গানের পরবর্তী লাইন ধরলো।

গান পাগলা ছেলে এই কালীপদ। বাপ হাসান সেখের নৌকার মাঝি ছিল। সুন্দরবনে শুকোয় গিয়ে কুমীরের খাদ্য হয়েছে। স্বজনহীন। দ্বিতীয়জন কেউ নেই তার। ঝাড়া হাত পা। এখন বাপের স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু কাজে মন নেই ছেলের। গানেই ঝোঁক। পেটে খানিকটা বিদ্যে আছে। মুখে মুখে গান বাঁধার এলেম আছে। গানের টানে নোটন বোষ্টমের আখড়ায় যায়। রাধা তার গানের দোসর। কেউ কেউ বলে ভালবাসা। নিন্দুকেরা বলে—পিরিতের নাঙ।

এখনো বৃষ্টি ঝরছে। আকাশে কালো মেঘের হুল্লোড়। মাঝে মাঝে আকাশ চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি। নদী মাতাল। গেরুয়া জল তোলপাড়। নৌকা টালমাটাল। এ হলো ফৌতি। পৃথিবী, আকাশ নদী পাগল হয়েছে। মাতাল হয়েছে।

জোয়ার এখন যুবতী।

গেরুয়া জল ঘুরতে ঘুরতে ছুটে আসছে সাগরের দিক থেকে।

—সেম্‌লে থাকিস কার্ত্তিক। আগাশের চ্যায়রা সুবিধের লয়। কালীপদর নৌকা থেকে হেঁকে সাবধান করলো মৈনুদ্দিন। অভিজ্ঞ পোড় খাওয়া মানুষ। আকাশ নদী বাতাস দেখে বিপদের গন্ধ পায়। এখানে সামান্যতম অসাবধানে অঘটন ঘটে। নৌকা ডোবে। মৃত্যু হানা দেয়। মানুষ মরে।

না, শেষ পর্যন্ত বিপদ এলো না। এলো ভাটার টান। গেরুয়া জলের বিপরীত পথে শুরু হলো পরিক্রমা। স্তিমিত হয়ে এলো নদীর মত্ততা।

হাবুল নবীন শ্রীকান্ত অভিজ্ঞ হাতে দ্রুত জাল তুলে নিল নৌকায়। জালে আটকেছে মাত্র ন'টা ইলিশ। এত পরিশ্রমের এই ফল! বিস্মিত সবাই। ফৌতির দিন, আশা করেছিল অনেক।

—কালী খবর কী? হেঁকে জানতে চাইলো কার্ত্তিক।

—সুবিধের লয় খুড়ো। মাত্তর দশটা।

ক্ষোভে জ্বলে উঠলো কার্ত্তিক।

—এ শালা ভগবানের চালাকি। নইলে সেই এক গাঙ, এক জল। এক জাল, ইলিশ কম কেন? ইলিশ কি ধরিত্তির পেটে সেঁদিয়ে গেল! হবে নে? হবেই তো। দেশ পাপে ভরে গেছে। আবড়া ছুঁড়ির প্যাট হচ্ছে। ভক্তি ছেরাদ্দ বলে কিছু আছে? গাঙের মুখ বাঁধলে মা গঙ্গার মকর যাবে কোথা দিয়ে? এ সব মা গঙ্গার অভিশাপ। যাবে, সব গোল্লায় যাবে। খানিক দম নিয়ে পুনরায় বললো—

—সারারাত জেগে মাত্তর ন'টা! এতে শালা মাগের পোঁদের ট্যানাও জুটবে নি।

জাল গুটিয়ে, নৌকা যখন ঘাটে ভিড়লো তখন কাকভোর। ঘাটে অনেক সাধারণ ক্রেতা। সস্তায় টাটকা মাছের লোভে বাজারে না গিয়ে ঘাটে এসেছে। পাইকার, পাজারীও আছে। ওরা ঝাঁকা মাথায় একেবারে কোমর জল পর্যন্ত নেমে এসে ধরলো নৌকাকে।

কে আগে মাছ নেবে। কোন্ মাছ নেবে তাই নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি। ঠেলাঠেলি গালাগালি। সবার দাবি সে আগে নৌকা ধরেছে। সেই সব পাবার অধিকারী।

আক্কাশের নানি কার্ত্তিকের নৌকা ধরে বললো—কি গো জেলের পো, মুই পাবুনি? মুই অগ্রে ধরনু। মন মেজাজ ভাল থাকলে রসিয়ে রসিয়ে পাজারী মেয়েদের দেখে কার্ত্তিক। কড়াকাড়ি ঠেলাঠেলিতে বিবসনা হলে বেশ দেখতে লাগে মাগীগুলোকে। আজ মন মেজাজ ভাল নেই। হতাশায় ক্ষিপ্ত। জুৎসই দেশজ কাঁচা খিস্তি দিয়ে বললো—

—পাবে পাবে। এমনি পাবে? দাম দিতি হবে বুঝলে। বিশেষ

অশ্লীল ইঙ্গিত করলো।

আক্কাশের নানিও কম যায় না। দশ বছর আছে এই লাইনে। পোক্ত মানুষ। পাল্টা খিস্তি দিয়ে বললো—

—হ্যাঁরে মুখপোড়া ঢ্যামনা। ধাঁড়ির ভাতার, তোর মুয়ে নুড়ো জ্বেলে দি।

রসিকতার জবাবে রসিকতা। স্থূল রসিকতা শ্রুতিকটু অশ্লীল শোনালেও এদের ব্যবহারিক জীবনের অঙ্গ। জীবনের আর পাঁচটা জিনিসের মত আটপৌরে। এতে অপমান বা রাগের কোন ব্যাপার ঘটে না। সহজভাবে গ্রহণ করে। পালিশহীন জীবনের মত। থাকে না পালিশের আস্তরণ। অনভ্যস্ত কানে অশ্লীল শোনাতে পারে কিন্তু এদের কাছে শ্লীল অশ্লীলের ফারাকটা বড় কম বলে সব একাকার।

বাজারের পাইকার সাধন ঝাঁকা মাথায় এসে দাঁড়ালো কার্ত্তিকের কাছে। চোখে চোখ রেখে ইশারা করলো। পাল্টা ইশারা দিল কার্ত্তিক। যার অর্থ আজ হবে না। অন্যদিন চোখে চোখে কথা হয়, ইশারার উত্তরে ইশারা। কিছু ইলিশ কৌশলে হাত ফসকে চলে যায় সাধনের ঝাঁকায়। আজ হলো না। কার্ত্তিক প্রথমেই দেখে নিয়েছে ক্রেতাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মহাজনের ছেলে। লক্ষ্য রাখছে।

ভীড় পাতলা হলে সামনে এলো ভরত।

—ক'টা হলোরে কার্ত্তিক ?

—ন'টা।

—সকলের বেশি বেশি। তোর কম কেন ? দু'নম্বরি করছিস ?

কি উত্তর দেবে কার্ত্তিক। নিশ্চয় অবিশ্বাস করছে। নীরব থাকলো।

—দে, আমাকে পাঁচটা দে। মাল আজ বাজারে যাবে নে।

—পাঁচটা কেন ? সবাই বিস্মিত। হিসাবমত চারটে পাওনা। হাবুল নবীন শ্রীকান্ত তাকালো ভরতের মুখের দিকে। ভরতের মুখটা মাদি ভোঁদড়ের মত লম্বা হয়ে গেছে যেন। লালা ঝরছে।

—বাড়িতে অনেক লোককুটুম। বাবা পাঠালো। দে তাড়াতাড়ি

দে। দোকানে যেতে হবে।

সেরা পাঁচটা ইলিশ নিজেই ব্যাগে ভরে নিল, তারপর মহাজনা মেজাজে চলে গেল হেলতে দুলতে।

ফ্যাল ফ্যাল করে তার চলে যাওয়া দেখলো কাত্তিক নবীন হাবুল শ্রীকান্ত।

অনেক পরে সম্বিৎ ফিরলো কার্ত্তিকের। ভরতের উদ্দেশে, ভরতের মায়ের উদ্দেশে নোংরা খিস্তি ছুড়ে নামলো নৌকা থেকে। সোঁদাল গাছের শিকড়ে বাঁধলো। নদীর চরে পোঁতা বাঁশের ভারায় ভিজে জাল শুকোতে দিল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ইলিশ ধরিয়ে দিয়ে বললো — চল। নিজেরটা একজন হাটুরে ক্রেতাকে বিক্রি করে বললো —

— তোরা আগা। আমার দেরি হবে।

ঢুকলো মদ্না শুঁড়ির দোকানে। ইদানীং মদনার ডেরায় যায় না কাত্তিক। মন মেজাজ বিগড়ে থাকলে যায়। আকণ্ঠ তাড়ি খেয়ে মাতাল হয়। অকারণে মানুষের সাথে ঝগড়া কাজিয়া করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে — শোধ নিচ্ছি।

কার ওপর শোধ নিচ্ছে ? কেন নিচ্ছে। কি ভাবে নিচ্ছে তা নিজেও জানে না। বুকের গহনের জ্বালাকে জুড়োতে আরো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তাতেও নেভে না বুকের আগুন। বাড়ি ফিরে সামান্য কারণে তুলকালাম করে। এই বয়েসেও স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে।

হাবুল নবীন ইলিশ দু'টো বিক্রি করে গণশার মুদী দোকানে ঢুকলো। শ্রীকান্ত হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরলো।

গাছের পাতার ফাঁক ফোকর গলে সকালের রৌদ্র শ্রীকান্তের কাদা-মাখা উঠোনে সোনালি আলপনা আঁকছে। গতদিনের ঝড় বাদলার চিহ্ন নেই আকাশের শরীরে।

দাওয়ায় পা ছাড়িয়ে বসে ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়াছে সরলা। ইলিশটা সামনে রেখে শ্রীকান্ত বললো —

— তোর জন্যে নিয়ে এলুম।

হাসলো সরলা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো ইলিশের চোখ ঝলসানো রূপ। পেল্লায় গঠন। জলকন্যার জৌলুস।

শ্রীকান্ত বুঝলো — আবহাওয়া শান্ত। রাগ নেই। গতকালের মেঘ কেটে গেছে সরলার মন থেকে। চারবছর যৌথজীবনের এই অভিজ্ঞতা। অভিমান থাকলে হাসে না সরলা। স্ত্রীর হাসি সঞ্চারিত হলো শ্রীকান্তের মধ্যে। সেও হাসলো।

গতকালের কথা ভুলে গেছে সরলা। নিজে সমস্তদিন অভুক্ত থেকেছে। মানুষটা না খেয়ে জালে গেছে। রাতভর রাক্কুসী গাঙের সঙ্গে লড়াই করবে। জীবন-মৃত্যু যেখানে সূক্ষ্ম সীমারেখার ব্যবধান।

সমস্ত রাত বিনিদ্র কেটেছে সরলার। বার বার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে। মানুষটার যেন কিছু না হয়। মা গঙ্গা ওর মঙ্গল করো। মানুষটা যাবার সময় খেতে চেয়েছিল। নিজেকে বার বার ধিক্কার দিয়েছে সরলা। অনুশোচনার আগুনে জ্বলেছে সারারাত। বার বার নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে আর কোনদিন এমন করবে না।

কাদাজলের মানুষ এরা। পুরানো, অতীতকে মনে রাখতে পারে না! রাখেও না। রাখলে চলে না। রাখার চেষ্টাও করে না। সুখ-দুঃখ বিবাদ কাজিয়া নিয়ে এরা জন্মায়। বড় হয়। চলমান জীবনের পথে চলতে চলতে ঝগড়া কাজিয়া করে। রাত পোহালে ভুলে যায়।

— জানিস বউ, এটা তোর জন্যেই নিয়ে এলুম। শালা ভামের বাচ্ছা মহাজনের জ্বালায় আনবার জো আছে! আঁকড়া পাঁকড়া করে বার করে নেয়। এটা জালের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম।

স্ত্রীকে খুশি দেখতে মিথ্যা বললো শ্রীকান্ত। স্ত্রীদের খুশি করতে স্বামীদের মিথ্যা বলা চিরন্তন রীতি। শাস্ত্র সম্মত। মানবসৃষ্টির আদিযুগ থেকে এ পদ্ধতি সগৌরবে প্রচলিত। চলছে। আজো চলছে। আগামী দিনেও চলবে।

— লুকিয়ে আনলে? মহাজন দেখতে পায় নে?

— না। আমি কি এত বোকা!

— এটা বিক্রি করে এসো। বললো সরলা।

— বিক্রি? কেন? শ্রীকান্তের চোখে বিস্ময়।

— কাল থেকে ঘরে কিছু আছে? সব বাড়ন্ত।

হঠাৎ কেউ যেন কালি ধেবড়ে দিল শ্রীকান্তের মুখে

॥ ৫ ॥

নদীর বাঁধ দিয়ে হেঁটে আসছে খগেন জানা। দুপুর না হলেও ভাদ্র মাসের রোদ বেশ চড়া। খালি পা। সাধারণত জুতো পায়ে দেয় না খগেন। শহরে অথবা আত্মীয় বাড়িতে গেলে জুতো ব্যবহার করে। কেন জানতে চাইলে বলে—

— ভাল লাগে না।

মাথায় ছাতা। ফিরছে পদ্মপুরের হাট থেকে। ঝুঝকো বেলায় বেরিয়েছিল আদায় উশুলের জন্যে। ফিরতে এত বেলা। চলার ছন্দে ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ির কৌটোর বিচিত্র ঝনাক্ ঝনাক্ শব্দ পথকে জানান দিচ্ছে। ওই শব্দ যাদের পরিচিত তারা ঘোর অন্ধকারেও বলে দিতে পারবে খগেন যাচ্ছে। ঘর্মাক্ত মুখ। ওষ্ঠে জ্বলন্ত বিড়ি। খগেনের বিশেষত্ব। বাড়ির বাইরে থাকলে সর্বক্ষণ মুখে থাকে জ্বলন্ত বিড়ি। ভীষণ ব্যস্ততায় নিভে যাওয়া বিড়িতে আগুন দেবার সময় হয় না। কিন্তু অভ্যাস মত ঠোঁটে চাপা থাকে।

নদীর চরে কয়েকখানা নৌকা মেরামত করছে মিস্ত্রিরা। খগেনের ইচ্ছা ছিল মরশুমের প্রথমেই ওগুলোকে মেরামত করে নদীতে নামাবে! কিন্তু সময়মত ভাল কারিগর না পেয়ে সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ঠিকমত মেরামত নাহলে দাদন দেওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে উমেদপুরের খুরশেদকে সাধ্য সাধনা করে, বেশি মজুরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনতে হয়েছে। গত

পরশু থেকে কাজ শুরু করেছে খুরশেদ। সে প্রধান কারিগর। বিশ্বকর্মা। তার নির্দেশ মত কাজ করছে চারজন কারিগর।

খগেনকে দেখে নমস্কার করলো খুরশেদ।

—নমস্কার বাবু।

প্রতি নমস্কার করলো খগেন।

—কাজ কেমন চলছে মিস্ত্রি?

—আজ্ঞে ভালই তো।

—কোন কিছুর অসুবিধা হচ্ছে না?

—না, না, সব ঠিক আছে। দু'সপ্তার মধ্যে একটা নৈকো গাঙে নাবিয়ে দোব।

অসমাপ্ত একটা নৌকা দেখিয়ে বললো—

—এটা তো হয়ে এলো বলে। শুধু 'গাওনাকি' বাকি। তারপর আলকাতরা নাগিয়ে দিলেই ফিট। একেবারে চাম্পিয়ান।

অন্য একটা দেখিয়ে বললো—ওটা পেরায় ঠিক আছে। 'দারোগা' পাল্টে দিলে এ সালটা চলে যাবে।

—আরো আগে নাবানো যেতু নি? ব্যাকুল প্রশ্ন খগেনের।

—তা কি হয় বাবু। ই-হলো নৈকোর কাজ। 'গড়ন তোলা', 'জলুইমারা', 'গাওনাকি', রঙ করা। তাড়াতাড়ি একাজ হয় না। সময় দিতে হয়। আসল কাজ তো 'গাওনাকি'। ঠিকমত নাহলে নৈকোয় পানি উঠবে। আমার গুরু বলতো—যেখানে যাই করিস ব্যাটা, নৈকোর কাজে ফাঁকি দিসনি। মানুষের জান লিয়ে কারবার। বদর পীর গোঁসা করবে। কয়ামতের দিন রেহাই পাবিনি।

কপালে হাত ঠেকিয়ে গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করলো খুরশেদ।

খুরশেদ নৌকার ভাল কারিগর। নামডাক আছে। যে কোন সময় ডাকলেই ওকে পাওয়া যায় না। কাজ নিয়ে দূর দূর চলে যায়। ওর হাতের কাজ বলাগড়ের মিস্ত্রিদের থেকেও সরেস। কৈশোরে সৎমায়ের অত্যাচারে

ঘর ছেড়েছিল। ভবঘুরের মত বহু জায়গা ঘুরে ঠেকেছিল চাটগাঁয়ে। সেখানে এক কারিগরের পোষ্য হয়ে ছিল অনেকদিন। তাতে শাপে বর হয়েছে। ভাল কারিগর হয়ে ফিরেছে। লোকে বলে খুরশেদের হাতের নৌকা হলে অনায়াসে সাগর পাড়ি দেওয়া যায়।

চারটে নৌকা মেরামত করতে অনেক সময় নিচ্ছে মিস্ত্রি। মজুরিও বেশি নিচ্ছে। কাজের লোক ঠিকই। কিন্তু মাটো। অন্য কারিগররা নেয় বারো টাকা ফুট। খুরশেদ নিচ্ছে পনেরো টাকা। টাকা বেশি নিচ্ছে, কাজেও দেরি করছে। খগেনের বিশ্বাস ইচ্ছা করে সময় বেশি লাগাচ্ছে মিস্ত্রি। নৌকা গাঙে নামাতে যত দেরি হবে, লোকসান বাড়বে তত বেশি। মরশুম চলে যাচ্ছে হুড় হুড় করে। সময়ের মধ্যে যদি ওগুলো কাজে না লাগে কী প্রয়োজন এত ব্যয় করে মেরামত করার। নেহাত দায়ে পড়ে বাপ বলা। খোশামোদ করা। ছোটলোকের তোয়াজ করা।

—একটা বিড়ি ছ্যান বাবু।

খগেন বিড়ি দিল। কানের পাশে পাক মেরে আগুন ধরালো খুরশেদ।

—বাবু কিছু ট্যাকা যে দিতে হয় আজ।

কর্মচারীদের দিকে তাকিয়ে বললো—ছোঁড়ারা বলছিল···

খগেন অবাক। গতকালই একশো টাকা নিয়েছে। আজ আবার চাইছে! টাকার গাছ ভেবেছে নাকি?

—কাল তো একশো টাকা নিলে মিস্ত্রি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। একশো ট্যাকায় কি চলে বাবু। এদের মাগ ছেলের প্যাট পোঁদ আছে। এখুন ছ্যান, হিসেবে বেশি হলে কেটে লেবেন।

খগেন পাঁচখানা গ্রামের দ্বিতীয় পয়সাওয়ালা মানুষ। এখন বড় মহাজন। জাল নৌকা অনেক। বিড়লাপুরে মুদী দোকান। নিজে লেখাপড়া জানে না, কিন্তু মেয়েকে কোলকাতার হস্টেলে রেখে পড়াচ্ছে। ছেলেটা অবশ্য বেশি লেখাপড়া শেখেনি। বকাটে। তবে মুদী দোকানটা ভালই

চালাচ্ছে। ব্যবসায়ী বুদ্ধি মন্দ নয়।

পড়শিরা খগেন সম্পর্কে কটূ মন্তব্য করে। সেকথায় কান দেয় না খগেন। বড়লোকের পেছনে অনেক প্যাঁড়া। এই আপ্তবাক্যটি মেনে চলার চেষ্টা করে। জানে মানুষ তাকে কৃপণ বলে। চামার বলে। বলে রান্নাভাতে নাম করলে হাঁড়ি ফাটে। কাগজে নাম লিখে গোরুর গলায় ঝুলিয়ে দিলে 'কেঁট' ঝরে যায়।

এও জানে সামনে বাবু বা কর্তা বললেও পশ্চাতে গালাগাল করে। আসলে দাপের কাছে নত তারা। আরো কারণ ফেলো কড়ি মাখো তেল নীতি মেনে চলে খগেন। সব কারবার নগদে। ধার বাকির কারবার করে না। ওতে বিশ্বাসও নেই। মানুষ তাকে গালাগাল করে তা অজানা নয়। বলে—

গালাগালে আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে নে। দিক না ওরা কত গাল দেবে। সময় হলে সব বাছাধনকে আমার কাছে আসতে হব। তখন সুদেমূলে আদায় করবো। করেও তাই। ধার কর্জের টাকা বাকি থাকলে গাছের কলা, ডাব, গুড়ের কলসি, হাঁস মুরগি, এমনকি উঠোনে শুকোতে দেওয়া মেয়েদের শাড়িও নিয়ে চলে আসে। অনুরোধ, কান্নাকাটিতে ফল হয় না। এখানে সে নির্মম। কোন দয়ামায়ার ধার ধারে না। তার বিশ্বাস নির্মম না হলে ওই হাভাতে হাঘরে ছোটলোকরা ভয় করবে না। মেনে চলবে না। মাথায় উঠে নাচবে। এ হলো যেমন রোগ তেমন ওষুধ।

বিষ্টুপুরের কথা বলতে গেলে খগেনের কথা বলতে হবে। খগেন ছাড়া বিষ্টুপুরের কাহিনী অসমাপ্ত। প্রধান কুশীলবের একজন সে।

প্রতিবেশীরা বলে পরগাছা।

নিজেদের পছন্দমত নামকরণ করে নিয়েছে তারা। খগেন বলে না, বলে 'মুলুকে'। এর পশ্চাতে নিশ্চয় কারণ আছে। থাকাই স্বাভাবিক। আর সে কারণ হলো কেউ জানে না তার মুলুক কোথায়। আসলে খগেন পরজীবী। পরগাছা। যারা শিশু, যারা যুবক তারা হয়তো সে ইতিহাস

না জানতে পারে। কিন্তু যারা বৃদ্ধ, যাদের বয়স ষাট-সত্তরের মধ্যে তারা জানে।

খগেন কুড়ানো ছেলে। কি জাত, কে বাপ মা কেউ জানে না। সে এ মুল্লুকের মানুষ নয়। ভাসামানুষ। বয়স্করা বলে খুঁদির মা নামে একজন স্বজনহীনা বৃদ্ধার বাস ছিল বিষ্টুপুরে। বিধবা। যৌবন কালেই স্বামী সুন্দরবনের গহনে নিখোঁজ হয়েছে। খুঁদি নামের একটা মেয়ে ছিল। ভিনদেশী এক যুবককে বিয়ে করে চলে গেছে তার ঘরে। নদীতে খালে বিলে মাছ ধরে কষ্টে দুঃখে জীবন চলতো খুঁদির মায়ের। একদিন ভোরে নদীতে মাছ ধরার কালে ভাসমান তোলো হাঁড়ির মধ্যে শিশুর কান্না শুনে কৌতূহলী হয়ে তুলে দেখতে পায় কয়েকদিনের একটা শিশু। সেই কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে নিজের সন্তানের মত মানুষ করেছে খুঁদির মা।

সেই শিশু আজকের খগেন।

ঠিকানাহীন, সহায়সম্বলহীন পরিত্যক্ত যে শিশু একদিন কাঁদতে কাঁদতে ভেসে এসে ঠেকেছিল এই গ্রামের কিনারায়, মৃত্যু ছিল যার ভবিতব্য, সেই মানুষ এখন এলাকার ভাগ্যবিধাতা। বুদ্ধি আর অধ্যবসায়ের জোরে কয়েকখানা গ্রামের মধ্যে বিত্তবান। পনেরোটা নৌকার মালিক। জায়গা জমি পুকুর ব্যবসা ছাড়া ব্যাঙ্কে নগদ টাকা নিশ্চয় অনেক আছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর বড় হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাকে আজ এত উঁচুতে উঠতে সাহায্য করেছে। পৃথিবীতে যুগে যুগে তারাই তো বড় হয়েছে। সাফল্য পেয়েছে। যারা পরিশ্রম করেছে অদম্য। কৌশলে করায়ত্ত করেছে সম্পদ। বুদ্ধিকে শাণিত করে ব্যবহার করেছে ব্যবহারিক জীবনে।

গরীবের ছেলে দশ বছরেই সাবালক। ছেলের হাত ধরে খুঁদির মা নিয়ে গিয়েছিল ননী দাসের কাছে।

—কত্তা, আমার ব্যাটাকে একটা কাজ টাজ ছ্যাও। নাইলে উপোসে মরবে। এই বয়েসে আমি কি করে খেটে খাওয়াবো।

—ছেলের বয়েস কত?

—দশ বছর।

—ওই ছেলে কী কাজ করতে পারবে?

—সব কাজই পারবে। তুমি নাগিয়ে দও না।

ননী দাসের বাড়িতে রাখালের কাজ পেল খগেন। বেতন নয়, পেট ভাতায়। খুঁদির মা তাতেই খুশি। মন খুলে আশীর্বাদ করলো ননীকে। ছেলেটার হিল্লে হলো কত্তার দয়ায়।

অনাহারের দিন শেষ হয়ে সেদিন থেকে পেট ভরে খেতে পেয়েছিল খগেন।

ননী মালিক। খগেন রাখাল। সম্পর্ক আকাশ পাতাল ফারাক। তবুও খগেন মালিকের কাছাকাছি থাকে। মালিক তার কাছে আদর্শ। ভাবতো বড় হলে কর্তার মত হবে। সেই বয়েসেই খগেনের উচ্চাশার জন্ম। ননী ছিল এলাকার ধনী মানুষ। জোতজমি, জালনৌকায় রমরমে অবস্থা। জেলেপাড়ার রাজা। ননী অবশ্য এ সম্পদ পেয়েছিল উত্তরাধিকার সূত্রে। ননীর দুই ছেলে। হরেন, নরেন। গ্রামের মানুষের কাছে হরে, নরে। ধনীর সন্তান হওয়ায় ছেলে দুটো মেপে দেখতে চায়নি পৃথিবীটা কত বন্ধুর। কুটো নেড়ে খাওয়ার চেষ্টা করেনি। স্বেচ্ছাচারী এবং বিলাসী হয়ে উঠেছিল শরীরে যৌবন আগমনের সাথে সাথে। বাপের চেষ্টা এবং আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও 'মানুষ' যাকে বলে তা হয়নি, লেখাপড়া শেখেনি। গতর খাটিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করেনি। তাদের কাছে সুরা আর নারী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া। তাদের খেদোক্তি—আহাঃ গাঙের জল যদি মদ হতো তাহলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকতুম। আমি ছাড়া পৃথিবীতে সবাই যদি মেয়েমানুষ হতো। কি মজা হতো। প্রতিদিন নতুন নতুন মেয়ে চাখতুম।

এলাকার কোন কুমারী কন্যা অথবা যুবতী বধূ নজরধরা হলেই গোপনে আড়কাঠির মাধ্যমে তাদের কাছে দামি দামি ভেট আসে। পিছিয়ে পড়া গরীব এলাকা। অনেকে প্রলোভন সম্বরণ করতে পারে না। প্রথম প্রথম প্রত্যাখ্যান করলেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারতো না জেদকে। গ্রহণ করতো। তারপর পরিস্থিতি আরো সহজ স্বাভাবিক হয়ে

গেলে সুযোগ বুঝে একদিন হাজির হতো ছ'জনের কেউ একজন, তখন বোঝা যেত ভেট আসতো কার কাছ থেকে, কেন আসতো।

ক্ষুধা যেখানে মৃত্যুর অপর নাম, সতীত্ব সেখানে বিলাসিতা। অনাহার যেখানে নিত্য, সতীত্ব সেখানে ভঙ্গুর। যুবতী বধূ কিংবা কন্যাদের সহজে আয়ত্তে আনে হরে, নরে। দুই ভাইয়ের অবস্থান খুব কাছাকাছি। একটু হেরফের। সুরা নারী অর্থাৎ মদ আর মেয়েমানুষ দুজনার কাছেই উপাদেয়। হাত তাদের দরাজ। নজরে ধরলে তাকে সবদিক দিয়ে ভরিয়ে দেবে। বধূ কিংবা যুবতী কন্যা হঠাৎ চিকন হলেই সে হয় উপহাসের উপাদান। অন্যেরা ঠারে ঠোরে ইঙ্গিত করে — হরে-নরের নজর পড়েছে যে।

তাছাড়া পরকীয়ার পৃথক আকর্ষণ আছে। রোমাঞ্চ আছে। মাদকতা আছে। ধনীর ছেলে হরে-নরে। দর্শনে সুশ্রী। পোশাকে ভদ্রলোক। যুবতী-মন ভোলে সহজে।

সব রাতে ঘরে ফেরে না। গ্রামের কোন্ প্রান্তে কোন্ ঝুপড়ির মানুষ গাঙে গেছে হরে-নরের কাছে সংবাদ চলে আসে। শিকারী বিড়ালের মত সতর্ক পদক্ষেপে কেউ একজন গিয়ে দাঁড়ায় তার বন্ধ দরজার সামনে। অন্যজন তখন হয়তো অন্য কারো ঘরে কিংবা তিন ফটকের গণিকা পল্লীতে রাত জাগার মহড়া দিচ্ছে।

মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মনে দুঃখ ছিল ননী দাসের ছেলে দুটো মানুষ হলো না। ননী যখন ছেলেদের জন্যে হা-হুতাশ করছে খগেন তখন বুদ্ধিতে শান দিচ্ছে। নিষ্পাপ মুখের আড়ালে দাউ দাউ আশার আগুন জ্বলছে। তক্কে তক্কে থাকে সর্বদা। মালিকের অনেক টাকা জানে। কিন্তু কোথায় জানে না। ননী কাঁচা মানুষ নয়। পোড় খাওয়া ইস্পাত। নিশ্চয় সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে। খগেনের সতর্ক দৃষ্টি ঘুরে ফেরে লুকানো সম্পদের সন্ধানে।

দীর্ঘ রোগভোগের পর মৃত্যুর পূর্বে ছেলেদের খুঁজলো ননী। কিন্তু

তারা তখন কোথায় কেউ জানে না। মাতাল হয়ে কোথাও পড়ে আছে হয়তো। নয়তো জলধরের বালবিধবা বোন হরিমতীর ঘরে শুয়ে আছে। অথবা গাঙে নামা কোন ইলিশমারার যুবতী বধূর শরীরে খুঁজছে স্বর্গসুখ। গ্রহণ করছে যৌবনের উত্তাপ।

ননীর মৃত্যু আসন্ন বুঝে সতর্ক হলো খগেন। বলা যায় না, সুযোগ কখন কি ভাবে কোন্ দিক দিয়ে আসে।

মৃত্যুর সাথে শেষ লড়াইয়ের সময় ছেলেদের খুঁজছে ননী। কী যেন বলে যেতে চায়। বিড়ালী সতর্কতায় খগেন গিয়ে দাঁড়ালো মালিকের মাথার কাছে। আলতো করে হাত রাখলো মৃত্যুপথযাত্রীর মাথায়।

ননী বিপত্নীক বহুকাল। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া দেখা শোনা করে। খগেন তাকে অন্য কাজের বাহানায় বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিল। মাথায় হাতের স্পর্শ পেয়ে ননী ভাবলো দুই ছেলের কেউ।

—হরে!

ঠোঁট চেপে যথাসম্ভব স্বর নকল করে খগেন বললো—হুঁ। খুশিতে উজ্জ্বল হলো বৃদ্ধের মুখ। মরণকালে সন্তানের হাতের জল স্বর্গবাসের পাথেয়। ইশারায় জল চাইলো। ননীর দৃষ্টি তখন ক্ষীণ। খগেন মালিকের মুখে জল দিল। বুড়ো স্বর্গ পাক। স্বর্গ পেয়েছে কি খগেন জানে না। তবে দুর্বল হাত দিয়ে ছেলের হাত ভেবে খগেনের হাত বুকে রেখে মাটিতে পোঁতা টাকার সন্ধান দিয়ে দিল।

হরে-নরে বাবার মৃত্যু সংবাদ পেল অনেক পরে। গ্রামের মানুষ পরের দিন সকালে হরেকে পেল অক্ষয় গায়েনের কানাচে। নরেকে পেল তিন ফটকের গণিকা পল্লীতে। বাবার মৃতদেহ উঠোনে নামিয়ে রেখে দুই ভাই পোঁতা টাকার সন্ধানে ঘরের মেঝে, দাওয়া, উঠোন কুপিয়ে একাকার করলো। কিন্তু কোথায় টাকা! কাঠের বাক্সে পাওয়া গেল মাত্র তিনশো কয়েক টাকা। খগেন তখন মালিকের মৃতদেহ আগলে কেঁদে চলেছে অবিরাম।

অনেক অনুসন্ধান করে যখন টাকার হদিশ পাওয়া গেল না, হতাশ হলো দুই ভাই। একজন দোষারোপ করলো অন্যকে। হরে ভাবলো নরে সব ঝেড়ে না জানার ভান করছে। অনুরূপভাবে নরে ভাবলো— দাদা তাকে ঠকিয়ে বাপের কাছ থেকে আগেই হাতিয়ে নিয়েছে। হাতা-হাতি অবশ্য করলো না, ঝগড়া কাজিয়া অনেক করলো। শেষে মৃত বাবার উদ্দেশে দু'জনেই অশ্লীল খিস্তি খেউড় করলো। বাপটা যে হাড় শয়তান এবং ঢ্যামনা ছিল এতদিন পরে বুঝলো।

ননীর মৃত্যুর পর ছেলেরা পড়লো অথৈ জলে। এতদিন বাপের বিশাল ছত্রছায়ায় সুখে ছিল। এখন মাথার ওপর খোলা আকাশ। একেবারে মুক্ত। পূর্বে ভেবেছিল বাবার মৃত্যুর পর অনেক টাকা পয়সা সম্পদ হাতে পাবে। ইতিমধ্যে নরে পরিকল্পনা কষে ফেলেছে তিন ফটকের নূরজাহানকে সোনার হার গড়িয়ে দেবে। বড় সুখ দেয় মেয়েটা।

খগেন ঠিক কত টাকা পেয়েছিল গ্রামের মানুষদের জানার কথা নয়। খগেনও জানে না। আনন্দের আতিশয্যে গুনতে পারেনি। নিরাপদও নয়। বাগানে বুনো গাব গাছের গোড়া খুঁড়ে চার কলসী পূর্বকালের রুপোর টাকা পেয়েছিল। প্রথমে একটুকরো জমি কিনে বাড়ি করলো।

ননীর মৃত্যুর পর হরে নরে তাকে বাড়িছাড়া করেছিল।

হরে নরে বাপের নগদ টাকা না পেলেও জোতজমি জাল নৌকা পেয়েছিল কিন্তু তাদের চরিত্র তা রাখতে পারেনি। বিক্রি করলো জোতজমি পুকুর বাগান জাল নৌকা। আর সেগুলো কিনলো খগেন। কয়েক বছর পরে দোতলা বাড়ি বানালো। বিয়ে করলো।

॥ ৬ ॥

রথ দেখা এবং কলা বেচা অতীতে চলতো। আজো চলে। বেআইনী পদ্ধতি নয়। আইনের লগবুকে এমন দৃষ্টান্ত হাজার হাজার আছে।

বরঞ্চ সুযোগ থাকলে ওই ত্রুটো না করা বেআইনি। সময়ের অপচয়। সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রে কর্তব্যে অবহেলা।

সময়ের অনেক পূর্বেই এসে হাজির হলেন স্থানায় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা। সরকারি দায়িত্বের সাথে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য থাকলে দোষের কি? আমলারা তো সরকারের ঘর-জামাই। তাদের ইচ্ছাই সব। সরকারেব তেল পুড়িয়ে, সরকারের সময় ব্যয় করে নিজের কাজ করা অথবা সরকারি সম্পত্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেওয়া গণতান্ত্রিক হক। শুধু তাই নয়। সরকারি সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার পরিবারেরও। নাহলে তুলকালাম। অধিকারে হস্তক্ষেপ।

খগেন জানা বুদ্ধিমান। কোন্ দেবতাব কি নৈবেদ্য ভাল জানে! কোথায় তেল দিতে হবে। কি তেল, কত দিতে হবে ভাল বোঝে। অতএব সরকার—প্রশাসনের সাথে হৃদ্যতা থাকা বাঞ্ছনায়। সরকারের সব কিসিমের আমলারা এলাকায় এলে খগেনের আতিথ্য গ্রহণ করে। তাতে লাভ বৈ লোকসান হয় না। উদরের পরিতৃপ্তিটা ভালই হয়। শেষে দানের দক্ষিণার মত ফেরার সময় মুফতে অনেক কিছু ধরিয়ে দেয় খগেন। গাছের নারকেল। পুকুরের মাছ। ক্ষেতের আনাজ। অনিচ্ছা প্রকাশ করলে ছাড়ে না। জোরপূর্বক ধরিয়ে দেয়। ঘুষ বলে কেউ অপবাদ দিতে পারবে না। আমিষের গন্ধহীন নিখাদ নিরামিষ। নিন্দুকেরা চিরকাল বলে —'পাখিটা মরে গেছে।' গুলি মারো নিন্দুকের কথায়। খগেন ও-সবের ধার ধারে না। সে মনে করে এগুলোর বীমার প্রিমিয়াম। এখন দিয়ে গেলে ভবিষ্যতে মুখে হাসি ফোটাবে। নির্ভরতা দেবে।

নানা রকম উপঢৌকন (খগেন ঘুষ বলে না) দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের খুশি রাখে খগেন। অন্যের সাথে তার বিশ্বাস মেলে না। সে বিশ্বাস করে সরকারি আমলারা এ যুগের ভগবান। অনেক ক্ষমতা ওদের। ওরা হয়কে নয় করে। নয়কে হয় করে। ওরা আকাশকে পাতাল বললে তা পাতালই হবে। ওদের খুশি করতে পারলে ওরা কাউকে

অখুশি করে না।

মূর্খ হলে কি হবে খগেনের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। মেয়ে বলে—বাবা একটু লেখাপড়া শিখলে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতো। চাইকি মুখ্যমন্ত্রী তো বটেই।

বি. ডি. ও. আসছেন খগেন জানে। আপ্যায়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত। বৈঠকখানা নিকিয়ে মুছিয়ে কাঁথির নক্সাদার মাতুর পাতা হয়েছে, তার ওপর তুধ-সাদা চাদর পেতে বসার জায়গা।

খগেনকে প্রাচীন মনে হলেও আসলে সে অত্যন্ত ধূর্ত। চতুর। বাবুরা ড্রইংরুম, চেয়ার টেবিলে অভ্যস্ত। স্বাভাবিক গ্রামীণ কায়দা ভাল লাগবে। এতে নতুনত্ব আছে। চমক আছে। বৈচিত্র্য আছে।

জিপ থামলো খগেনের বাড়ির সামনে। খগেন কনের বাপের ভঙ্গিমায় করজোড়ে দাঁড়ালো জিপের সামনে। নামতে সাহায্য করলো আগন্তুকদের।

বৈঠকখানায় বসিয়ে গাছ থেকে সগু নামানো নেয়াপাতি ডাবের মুখকেটে হাতে হাতে ধরিয়ে দিল। এরপর কাঁচের প্লেটে কুঁচানো ফল। পাথরের শান্‌কিতে আদার কুচি দিয়ে তেল মাখানো মুড়ি। শেষে চা।

সাধারণ চা নয়। কোলকাতা থেকে বিশেষভাবে আনানো।

খগেন প্রায়ই যায় ব্লক অফিসে। ব্লক অফিস হলো এ যুগের কল্পতরু। হাজার রকম সুযোগ সুবিধা ঝরে ওখান থেকে। শুধু তক্কে তক্কে থেকে কুড়িয়ে নিতে পারলেই হলো। অন্যভাবে বললে—ফলন্ত আম গাছের মত। সময় বুঝে নাড়া দিলে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে সুস্বাতু আম। মাসের পনেরো দিন খগেন ধর্না দেয় ব্লক অফিসে। কেরানী কর্মচারী বেয়ারা সবাইকে তেল দেয়। খোশামোদ করে। বলা যায় না কার কেমন এলেম। কার হাত দিয়ে কখন কি ঝরে পড়ে।

গত একমাস একটা পাম্পসেটের জন্যে প্রায় প্রতিদিন খগেন ঢুঁ মারছে ব্লক অফিসে। পাম্প ভাড়া নিয়ে চাষ পোষায় না। লাভের গুড় পিঁপড়ে খাচ্ছে। খরচ বাড়ছে। কয়েক হাজার টাকায় পাম্পসেট কেনা যায়। কিন্তু খগেনের যুক্তি তদ্বির করলে যদি পাওয়া যায় ছাড়বো কেন।

—খগেনবাবু, মৎস্যজীবীদের জাল নৌকা প্রভৃতি সরঞ্জাম কেনার জন্য সরকার মোটা টাকা লোন এবং অনুদান দিচ্ছে। আগামী শনিবার চব্বিশ তারিখ আপনার এলাকায় যাচ্ছি সরেজমিন তদন্ত করতে।

বি. ডি. ও. অনিল তালুকদারের কথায় মোমের মত গলে পড়লো খগেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয় যাবেন। দয়া করে আমার দুয়ারে পায়ের ধুলো দেবেন! গরীব মানুষ। আপনাদের মত মানুষদের পদধূলি পেয়ে কৃতার্থ হবো।

—নিশ্চয় যাবো আপনার ওখানে।···খগেনবাবু, আপনার বড় পুকুর আছে?

ফতুয়ার ভেতর দিয়ে পিঠ চুলকালো খগেন। মনে মনে বললো—

—শালা হারামির বাচ্চা জানে না পুকুর আছে কিনা। ন্যাকামি।

হেসে বললো—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের পাঁচজনের কৃপায় আছে।

—বড় বড় মাছ আছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তা আছে। আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে।

পাশের ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বি. ডি. ও. বললেন—

—অমিয়বাবু মাছ ধরতে খুব ভালবাসেন কিনা।—অমিয়বাবু, আমরা চব্বিশ তারিখে খগেনবাবুর এলাকায় যাচ্ছি। ওনার বড় বড় পুকুর আছে। ছিপ নেবেন নাকি?

ছাঁটা গোঁফের ফাঁকে হাসলেন অমিয়বাবু। হাসলে ভাল দেখায় ভদ্রলোককে। বললেন—

—কথাটা আমাদের বলতে হলো? আমি ভাবছিলাম খগেনবাবু নিজেই নিমন্ত্রণ করবেন। দেরি হলেও আমি বিশ্বাস করি উনি আমাদের বিমুখ করবেন না। মানুষ দেখে চিনতে পারি। কী বলেন খগেনবাবু?

খগেন বুঝলো প্রচ্ছন্ন তেলানো। না বোঝার ভান করলো। সরকারি

কর্মচারী মানে রাজার অনুচর। সোজা কথা ঘুরিয়ে বলে।

হাত জোড় করে বললো—

—আজ্ঞে আপনারা যাবেন জানলে আমি নিজেই নেমন্তন্ন করতুম, আসুন আপনারা। সবাই আসুন। সপরিবারে আসুন। দুপুরের সেবা গরীবের বাড়িতেই সারবেন। হেঁ হেঁ আপনারা গেলে আমার বাড়ি ধন্য হবে। আমার চোদ্দ পুরুষ ধন্য হবে। কী যে বলবো বি.ডি.ও. সাহেব। ঘরের কথা বললে মনে ভাববেন বাড়িয়ে বলছি। আপনারা এলে আমার পরিবার ভীষণ খুশি হবে। সে অতিথি সেবা করতে ভীষণ ভালবাসে। খুব দয়াবতী।

বাড়ির লাগোয়া শান বাঁধানো পুকুর। বিঘা তিনেক জলকর। ননী দাসের ছিল। হরে-নরের থেকে কিনে বাড়িয়েছে খগেন। পুকুরের চারিদিকে সারিবন্দী নারকেল সুপারির গাছ। একটু ঘোলা জল। গুঁড়িপানা আছে অল্পস্বল্প। রানাওয়ালা শান। ঘাটের পাশেই বিরাট কামিনী ফুলের গাছ।

অমিয়বাবু পুকুরের চারদিক পর্যবেক্ষণ করে বললেন—

—ঘাটের পাশেই বসা যাক। সুবিধা হবে। জল বেশি। মাছ বসবে এখানে। ঘাটের পাশে 'চার' করলেন অমিয়বাবু। বহু রকম, বহু গন্ধওয়ালা উপচার দিয়ে। কামিনী গাছের শীতল ছায়ায় মাথায় শোলার হ্যাট, চোখে রোদ চশমা দিয়ে ঘাটের রানায় বসলেন অনিলবাবু এবং অমিয়বাবু। দু'খানা দু'খানা হুইল ছিপ।

হাতের সাহায্যের জন্যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মদনকে এনেছেন। কিন্তু তাকে কাজ করতে দিল না খগেন। বললো—

—আপনারা আমার অতিথি। নারায়ণ। আপনাদের সেবা করা ভগবানের সেবা করা। পরজন্মে স্বর্গবাস।

মাছ ধরতে এত রকম মশলা লাগে, এত রকম তাদের গন্ধ খগেনের জানা ছিল না। সেও মাছের কারবারি। মাছ ধরে। তবে মাছের পেছনে

তেল দিয়ে নয়। গাঙে জালের ফাঁদ পেতে রাখে। যে শালা মাছ ঢুঁ মারবে সেই ফাঁসবে। ফাঁসেও। এ সব তেল তেলানি খগেনের পোষায় না। দিনভর মাছের ভজনা করা। সাধ্যসাধনা করা। দূর্ দূর্, এ অনিশ্চিতের পেছনে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকা।

প্রমাণিত হলো তাই। এত দামি দামি উপচারে চারে মাছ এলো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাৎনা অনড়।

এক আধবার, একটু একটু টানছে কিন্তু গিঁথছে না। অমিয়বাবুর ধারণা ছোট ছোট চিংড়ি মাছ ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

চারে মাছ না আসুক খগেনের বাড়ির অন্দরমহল থেকে নানা রকম মুখরোচক খাবার আসতে থাকলো ধারাবাহিকভাবে। শ্রীমতী জানা যে ভীষণ অতিথি পরায়ণা তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তালুকদারের। এ সব খগেনের বিশেষ ব্যবস্থা। সরকারি দেবতাদের তোয়াজ করা। খুশি রাখার কৌশল।

খগেনের বিশ্বাস পেটে উপাদেয় খাদ্য পড়লে সব শালাই উদার হয়। মানুষ তো দূরের কথা দেবতারাও পটে যায়! এই যে বেহুলা নিশ্চয় ভাল রান্না জানতো। সাবিত্রীও তাই। দেবতাদের পটিয়ে স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছিল। নিশ্চয় পিঠে পুলি পায়েস পোলাও হালুয়া করে খাইয়েছিল সে যুগে। পাঁচ স্বামীকে বশে রাখতে দ্রৌপদী নিশ্চয় ব্যবহার করেছিল সুস্বাদু রান্না। তাইতো কথায় বলে 'রন্ধনে দ্রৌপদী।'

কথা প্রসঙ্গে খগেন মেয়েকে উপদেশ দেয়।

—ভাল করে রান্নাটা শেখ। আখেরে কাজ দেবে।

চা নিয়ে এলো লেখা। খগেনের মেয়ে। রঙ বাপের মত কালো নয়। ফর্সা। প্রথম যৌবনের বিশেষ শ্রী আছে শরীরের পাতায় পাতায়। যৌবনের প্রথম পাপড়ি মেলছে শরীরের আনাচে কানাচে।

—খগেনবাবু, মেয়েটি আপনার? জানতে চাইলেন তালুকদার।

ফতুয়ার পকেটে হাত মুছে খগেন বললো—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার মেয়ে। কোলকাতার কলেজে পড়ে। এবছর

বি. এ. পাশ দেবে।

মেয়ের গর্বে মুখ উজ্জ্বল দেখালো খগেনের।

তালুকদার লেখাকে উদ্দেশ করে বললেন—

—খয়ের না দিয়ে একটা পান নিয়ে এসো তো মা।—অমিয়বাবু আপনার লাগবে নাকি?

ফাৎনা নড়ছে। সেদিকে দৃষ্টি রেখে অমিয়বাবু বললেন—

—হ্যাঁ। জর্দা দিয়ে। লালবাবা।

লেখা আরো কিছু আদেশের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ব্যস্ত হলো খগেন—যা যা তাড়াতাড়ি যা।

খগেন ঘোড়েল মানুষ। বোঝে কখন কার খিদমতগিরি করলে কী লাভ। কতটা লাভ। হাওয়া উঠলেই বুঝতে পারে বৃষ্টি হবে কি না।

তালুকদারের গায়ে পায়ে লেগে থাকলো সর্বক্ষণ।

দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজ। অমিয়বাবুর ভাষায়—লাঞ্চ। খগেনের কথায় —সেবা।

পুকুরের টাটকা মাছ—(না ওদের ছিপে ধরা পড়েনি। খগেন লোক দিয়ে খেপ্‌লা জাল ফেলে অন্য পুকুর থেকে ধরিয়েছে।) সঙ্গে মুরগির মাংস সহযোগে বিশাল আয়োজন। বি.ডি.ও. অনিল তালুকদার এবং অমিয়বাবু আকণ্ঠ উদর ভরিয়ে বৈঠকখানায় একটু গড়িয়ে নিলেন। জিপের ড্রাইভার সুকুমার এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মদন বিশাল আয়োজনের কিছু অংশ পেল। তাতেই খুশি তারা।

দুপুরের পর রৌদ্রের তেজ একটু কমলে পুনরায় ছিপ নিয়ে মৎস্য সাধনায় বসলেন ওরা।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলো। দিনের অবয়বে চেপে বসছে বার্ধক্যের কালো হাত। সূর্যের প্রখরতা ঝিমিয়ে এলো। কিন্তু ছিপে একটিও মাছ গাঁথলো না। 'চারে' মাছ এসেছে। 'ফুট' দেখে বুঝেছেন অভিজ্ঞ অমিয়বাবু। দুঃখের ব্যাপার শেষ পর্যন্ত বঁড়শিতে গাঁথলো মাঝারি মাপের একটা তুল বেলে। অমিয়বাবু বিস্মিত। এত বড় পুকুর। মাছও আছে

যথেষ্ট। ঘাই আছে। তবুও মাছ হলো না। আশ্চর্য। অমিয়বাবু হতাশ। অনিল তালুকদারকে বললেন—ভাগ্য খারাপ স্যার। এ রকম ঘটনা আমার জীবনে প্রথম ঘটলো। অমিয়বাবু যত না হতাশ খগেনকে দেখালো আরো বেশি। হেঁ হেঁ করে বললো—

—আমার ভাগ্যটাই খারাপ হুজুর। আপনাদের খুশি করতে পারলুমনি।

চৌকিদার মারফৎ গ্রামে সংবাদ দেওয়া ছিল বি.ডি.ও. আসছেন। মাছ-মারাদের ঋণ দেবার ব্যাপারে আলোচনা করতে। সরকারি ঋণের আশায় দুপুরের পর এলাকার মাছমারারা জমায়েত হলো খগেনের বৈঠকখানায়। এখানেই আসবেন বি.ডি.ও.। কেউ কেউ পঞ্চায়েত অফিসের কথা তুলে-ছিল। পঞ্চায়েত প্রধানের প্রস্তাব—এখানেই ভাল। একসাথে অনেক মানুষ বসতে পারবে।

কার্ত্তিক শ্রীকান্ত হাবুল নবীন কালীপদ মৈনুদ্দিন প্রায় সবাই এসেছে। দেড়শো মানুষের জমায়েত। অনেক আশা নিয়ে এসেছে। অন্যান্য জায়গায় সরকার ঋণ দিয়েছে ওরা জানে। এজন্য প্রচণ্ড আশাবাদী। সরকারি ঋণ বা অনুদানে জাল নৌকা করতে পারলে স্বাধীনভাবে মাছ ধরতে পারবে। তাহলে মহাজনী ফাঁসের টান গলায় থাকবে না, পূর্ব-পুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তের কিঞ্চিৎ ইশারা দেখতে পাচ্ছে!

স্বপ্নটা ওদের চিরকালের। পূর্বপুরুষরা স্বাধীন ছিল। ইচ্ছামত জাল দিত নদীতে। মাছ ধরতো। ভাগীদার অংশীদার ছিল না!

মা গঙ্গা যা দিত সব থাকতো নিজের।

তখন মা গঙ্গা দিত দু'হাত ভরে।

তারা ছিল গাঙের রাজা।

তখন জেলে পাড়ায় জৌলুষ ছিল। জেলেদের মান ছিল। মর্যাদা ছিল। এরপর কেটে গেছে বহু বছর। নীরবে। এখন জেলেরা পরাধীন। মহাজনের ফাঁসের দড়িতে বাঁধা। মহাজনের মর্জির ওপর নির্ভর করছে

জীবন জীবিকা। মরাবাঁচা। বি. ডি. ও. সাহেবের কাছে ওদের অনেক প্রত্যাশা। সরকারি ঋণে জাল নৌকা হলে স্বপ্ন সফল হবে। সবটা যদি নাও হয় শুধু জাল হলেই ওরা খুশি। নৌকা ভাড়া নিয়ে চালিয়ে নেবে।

বিকালে মাছধরার শেষে বি.ডি.ও. খগেনের বৈঠকখানায় বসলেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ এবং পঞ্চায়েত প্রধান অক্ষয় বাগও সঙ্গে থাকলো। বি.ডি.ও. মাছমারাদের অভাব অভিযোগ শুনলেন। অনেক-রকম প্রশ্ন করলেন। জানালেন সরকারি ঋণ পাবার আইন কানুন। পদ্ধতি প্রকরণ। পরিশোধ করার নিয়ম এবং সময়সীমা। লিখে নিলেন নাম-ধাম পেশা। জানালেন সরকারি আইন মোতাবেক পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ঋণের টাকা দেওয়া হবে।

পঞ্চায়েত শুনে হতাশ হলো মৎসজীবীরা। বেলাকবাবু থাকতে আবার পঞ্চায়েত কেন! প্রধান খগেনের পেটোয়া লোক। অনেক দরখাস্ত হজম করেছে। দু'একজন বি.ডি.ও.-কে কিছু বলতে চাইলে খগেন কানে কানে প্রধানকে কিছু বললো। প্রধান গ্রামবাসীদের বললো—

—তোরা ঘাবড়াচ্ছিস কেন, আমি তো থাকলুম। যা কিছু করার করে দোব।

বি.ডি.ও. সেই কথাই বললেন—

—অক্ষয়বাবু সব জানেন। উনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

বি. ডি. ও.-র আশ্বাসবাণীতে ভরসা থাকছে না মাছমারাদের। অক্ষয়কে হাড়ে হাড়ে চেনে। মাস্টার হলে কি হবে নাক উঁচু ব্যবহার। খগেনের চামচা। হয়কে নয় করে, নয়কে হয় করে। পঞ্চায়েত মানেই হয়রানি। এখন ওরা আফসোস করে, ভোটের সময় লোকের কথায় ভুলে, পাঁচটাকার লোভে অক্ষয় মাস্টারকে ভোট দেওয়ার জন্যে। তখন কি কেউ জানতো খাল কেটে কুমির আনছি। তিন বছর কত কাজ হয়েছে অন্য এলাকায়। এখানে কিছু হয়নি। শুধু খগেনের দলিজের সামনে একটা জলের কল হয়েছে। আর চালকলের রাস্তায় ইঁট বিছানো হয়েছে। ব্যস, এই হচ্ছে তিন বছরের কাজের খতিয়ান।

বি. ডি. ও. সাহেব শুধু হাতে ফিরবেন এ কেমন কথা! খগেনের পক্ষে লজ্জার। পূজা অসম্পূর্ণ থাকলে দেবতা অসন্তুষ্ট হবেন। সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত ঘটবে। পুনরায় জাল দিয়ে কেজি তিনেক দু'টো রুইমাছ এনে খগেন বললো—

—সাহেব, খালি হাতে ফিরতে নেই। গেরস্তের অমঙ্গল হয়। এ দু'টো নিয়ে যাবেন।

হাঁ হাঁ করে উঠলেন অনিল তালুকদার। অবাক হলেন অমিয়বাবু।

—আরে খগেনবাবু এসব কী করছেন। এসব কী হবে?

খগেন স্বভাবসিদ্ধ হেসে বললো—এ আর এমন কি? আপনাদের সময়ের দাম কত। সকাল থেকে কষ্ট করলেন এখন খালি হাতে ফিরবেন এ কখনো হয়। মেমসাহেব রাগ করবেন।

—কিন্তু এর দাম তো অনেক!

—তা হোক গে। আমার চাষের জিনিস। না নিলে ভীষণ দুঃখ পাবো। খুকির মাও কষ্ট পাবে।

অন্তরালবর্তিনীর সব দিকে দৃষ্টি। যারপরনাই বিস্মিত হলেন তালুকদার। পৃথিবীর সব মহিলা যদি এমন হতো, চকিতে চিন্তার স্রোতে ভেসে উঠলো নিজের বাড়ির চিত্র। মনে মনে ভাবলেন সবাই কেন এমন হয় না। সব বাড়ির মহিলারা যদি এমন হতো স্বর্গ তৈরি হতো মাটির পৃথিবীতে।

মাছ দু'টো জিপের পেছনে উঠিয়ে দিল খগেন। নমস্কার বিনিময়ের পর একরাশ কালো ধোঁয়া ছুড়ে চলে গেল বি.ডি.ও.-র জিপ।

অনেক আশার ঝিলিমিলি রেখে গেলেন মাছমারাদের মনে। বলা যায় না। পূর্বে হয়নি—এখন হতে পারে। তাছাড়া কোন বেলাকবাবু আমাদের কাছে এসেছে?

মাছমারারা ভাবলো—এতদিনে ভাগ্যের বন্ধ দরজাটা বুঝি খুললো।

নিজের জাল নৌকা হবে। ঘর বাড়ি হবে। ছেলেরা জজ ব্যালেষ্টর হবে। আরো অনেক কিছু হবে।

রাতে নিজের একান্ত সময়ে স্ত্রীকে শোনালো অনেক আশার কথা। স্বপ্ন দেখালো। অনেক প্রতিশ্রুতি দিল। বহুদিন পর নিশ্চিন্ত মিলনে স্বর্গসুখ অনুভব করলো। অনেক পরিকল্পনার জাল বুনলো। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছায়াছবি চোখের পর্দায় ভাসতে থাকলো।

দরখাস্ত দিয়ে শবরীর মত প্রতীক্ষা করছে মাছমারারা। ভাবছে ঋণের টাকা এলো বলে। দু'একদিনের মধ্যে সংবাদ এসে যাবে। আশায় দিন গুনছে, এদিকে তরতরিয়ে চলে যাচ্ছে দিন। সময়। চলে যাচ্ছে মরশুম। সরকারি হাতের মুঠি আর খোলে না। দু'একজন উৎসাহী ধর্না দিল পঞ্চায়েত দপ্তরে।

বোনাইয়ের হাসি হেসে অক্ষয় জানালো—

—আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। টাকা লাফিয়ে লাফিয়ে এসে পড়লো। তবে কিনা সরকারি ব্যাপার তো। ওদের আঠারো মাসে বছর। টাকা এলেই তোদের সংবাদ পাঠাবো। কষ্ট করে এখানে আসতে হবে না।

—কতদিন লাগবে মাস্টারমশাই?

—তা কি এখন বলা যায়।

কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলো। এ শালা গরমেণ্টের ভড়কি। এর নাম সরকারি বাঁশ। নিসাড়ে যায় টের পাওয়া যায় না। যন্ত্রণা হয় রক্ত বার হয় না। আশায় আশায় আরো একমাস বয়স বাড়লো মরশুমের। শেষে কয়েকজন গেল ব্লক অফিসে। বিস্মিত হলো বি.ডি.ও.-র কথা শুনে। উল্টে তিনিই অভিযোগ করলেন। ধমকালেন।

—আপনাদের সমস্ত নিয়ম-কানুন বুঝিয়ে বললাম। তবু সময় মত আবেদন করলেন না!

—সাহেব আমরা অনেকদিন আগেই পঞ্চায়েত পেধানের কাছে দরখাস্ত জমা দিইছি।

বি.ডি.ও. হাসলেন।

—পঞ্চায়েত অফিসে খোঁজ নিন। এখানে কোন আবেদনপত্র এসে পৌঁছায়নি। অন্যান্য এলাকার টাকা চলে গেছে অনেকদিন।

বি. ডি. ও-র থাপ্পড় খেয়ে ফিরে অক্ষয়কে বলতে সে বললো অন্য কথা।

—পিঠ বাঁচাবার জন্য শালারা অমন কথা বলেছে। এই দ্যাখ কাগজপত্র।

একতাড়া কাগজ টেবিলের ওপর ফেলে দিল পঞ্চায়েত প্রধান।

—কিছু বুঝলি? বুঝলি না? সব ভুল ভাল লেখা হয়েছে। এমন ভুল লেখায় সরকারের টাকা পাওয়া যায় না। এগুলো ব্লক অফিস থেকে ফেরত এসেছে। বুঝলি?

পঞ্চায়েত অফিসের সেক্রেটারিও ওই কথা বললো। তাহলে? অনেক প্রশ্ন মানুষগুলোর মনে।

মাছমারাদের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে অক্ষয় বললো—

—তোরা ভেবেছিলি সরকার দানছত্র খুলেছে। ক্যালার পাতে লিখে দিলেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে দেবে? অত সস্তা নয় সরকারের টাকা। মান বাঁচাবার জন্যে, ভোট নেবার জন্যে অমন পেলান করে শালারা। ব্যস ওই পর্যন্তই। কাগজে কলমে পেলান থাকে। রেডিওতে প্রচার করে। সরকারি কাজ এর বেশি হয় না।

মাছমারারা বিস্মিত হলো অক্ষয় প্রধানের কথায়। কেউ বিশ্বাস করলো, কেউ করলো না। সরকারি গ্যাঁড়াকলটি ঠিক কোথায় বসানো আছে বহু চেষ্টা করে হদিশ বের করতে পারলো না। কিন্তু হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলো গ্যাঁড়াকলটির অস্তিত্ব।

॥ ৭ ॥

তরতরিয়ে চলে যাচ্ছে সময়। ছুটি শেষ হতে এখনো দুসপ্তা বাকি, পুনরায়

ফিরে যেতে হবে দৈনন্দিন জীবনের গড্ডলিকায়। ফিরে যেতে হবে কোলকাতায়। হস্টেলে। একমাসের ছুটি দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো। সুকান্ত বলেছিল – চিঠি লিখবো। লেখা নিষেধ করেছে। বাবা সেকেলে মানুষ। সহজে মেনে নেবে না। মেরে ফেলবে। আর মা! সৎমা, আরো কঠিন ঠাঁই। বাপ যদিও বাৎসল্যের টানে মেনে নিতে পারে মা জানলে চিতার মত জ্বলবে। সতীনকন্যা, এমনিতে দু'চোখের বিষ। উঠতে বসতে কথা শোনায়। গঞ্জনা দেয়।

লেখা সুকান্তকে বলেছিল – তুমি চিঠি দেবে না। একটা মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আমি আবার কোলকাতায় চলে আসবো।

লেখা এখন ভাবছে ছুটি একমাস না হয়ে কম হলে ভাল লাগতো। গ্রামের বাড়িতে একদম ভাল লাগছে না। যদিও জন্মভূমি, নাড়ির টান, তবুও একাকাত্বের যন্ত্রণা ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে। দুঃখ সুখেব কথা বলার মত কেউ নেই। পাড়ার সমবয়সী কারো সাথে মিশতে বাবার নিষেধ। আর মা সাথী হিসাবে মোটেই গ্রহণযোগ্যা নয়। সবসময় ক্ষিপ্ত। কারণ বুঝতে পারে না লেখা। মা কেন অমন। পান থেকে চুন খসলেই গজর গজর করে। ঠারে ঠোরে কথা শোনায়। মৃত মাকে সামনে এনে অশালীন উক্তি ছুড়ে দেয়।

কলেজ খুললে মুক্তি পায়। দমবন্ধ করা অন্ধ পরিবেশে এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছা করছে না। হাঁপিয়ে উঠছে।

পশ্চিম দিগন্তে গাছ গাছালির অন্তরালে নেমে যাচ্ছে সূর্য। নদীর এলোমেলো বাতাস আলতো পরশ দিচ্ছে লেখার মুখে। ঘাটের রানায় বসে অনেক কথা ভাবছে সে। এখানকার কথা। সুকান্তের কথা। কোলকাতার কথা।

– বারবেলায় এখেনে বসে আছিস যে? শরীর খারাপ?

মা পেছনে দাঁড়িয়ে।

মাথা নাড়লো লেখা।

– এমনি বসে আছি।

—একা আমি হিমশিম খাচ্ছি। হাতের কাজ তো একটু করতে পারিস। দুদিন বাদে তো চলে যাবি।

দ্বিরুক্তি না করে উঠে দাঁড়ালো লেখা। এরপর মায়ের হাতের কাজে সাহায্য না করলে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধবে। কলেজ পড়া মেয়ে হলেও কোন রেয়াত করে না। এমন কথাও দু'একবার বলেছে—কলেজে পড়ে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে। নাকি জজ ব্যালেস্টর হয়ে গেছে। যতই লেখা পড়া করুক ভাতারের ঘর করতে হবে। ছেলেও বিয়োতে হবে।

গরীব ঘরের সুন্দরী দেখে দ্বিতীয় পক্ষ বিয়ে করেছে খগেন। অভাবের সংসার থেকে প্রাচুর্যের মধ্যে এসে শ্রীমতী জানা মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছে না। স্বামী ছাড়া কাউকে রেয়াত করে না। মেনে চলে না। স্বভাবে বেপরোয়া। অনেক অভিযোগ বিভিন্ন তরফ থেকে খগেনের কানে যায়। স্বচক্ষেও দেখেছে অল্প বিস্তর। তুলনা করেছে প্রথম পক্ষের সাথে। তবুও কড়া হাতে শাসন করতে পারে না। বয়েস কম। চপল মতি। বলা যায় না কোন্‌দিন দড়ি নিয়ে ঝুলে পড়বে। নয়তো গায়ে আগুন লাগাবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের স্বাদই আলাদা। শাসন করতে হাত ওঠে না। কিল খেয়ে কিল হজম করতে হয়। অনেক জেনেও চেপে যায়। এই বয়েসে ঘরে অশান্তি আনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সূর্য ছুটি নিচ্ছে আজকের মত। লেখা এসে দাঁড়ালো উঠোনে। ধীরে ধীরে কালো হয়ে আসছে পৃথিবীর আকাশ। কুন্‌কে মেপে মুনিষদের গামছায় মুড়ি দিচ্ছে লেখার মা।

—তুমি সরো। আমি দিচ্ছি।

একনজর মেয়ের দিকে তাকিয়ে মা বললো—

—থাক। রাজকন্যেকে এ কাজ করতে হবেনে। সোনার অঙ্গে কালি পড়বে। আমি দাসীবাঁদী আছি করছি। তুমি বরঞ্চ জল দিয়ে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করো।

লেখা জানে মা ওই রকমই। সহজ কথা সোজা করে বলে না। বাঁকিয়ে

অলঙ্কার দিয়ে কথা বলায় কেউ আহত হলো কিনা, কেউ কিছু মনে করলো কিনা তার ধার ধারে না। আসলে সে শিক্ষার অভাব আছে। অভাব আছে সহবতের।

মায়ের কথার ওপর কথা চলে না। অশান্তি বাড়ে।

ঘটিতে ভরে মুনিষদের জল এনে দিল লেখা। আজ ছ'জন মুনিষ কাজ করেছে বাগানে। মুখে কয়েকমুঠো মুড়ি ফেলে, ঘটির গলাটিপে ঢক ঢক করে অনেকটা জল গলায় ঢেলে, অবশিষ্ট মুড়ি গামছায় বেঁধে চলে গেল মুনিষরা।

সন্ধ্যা নেমেছে।

—এবার তুলসীতলায় সন্ধ্যেটা দেখাও।

লেখার উদ্দেশে বললো মা।

কাপড় বদল করে, থালায় দু'টো প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিটা ঘর, গোলাঘর, ভাঁড়ার, গোয়াল ঘরের প্রতিটা দরজায় প্রণাম করে, প্রদীপ দু'টো উঠোনে তুলসী তলায় রেখে আভূমি প্রণাম করলো লেখা। শাঁখ বাজালো। একবার, দু'বার, তিনবার।

প্রার্থনা করলো—সবাইকে ভাল রেখো ঠাকুর। সকলের মঙ্গল করো। ওর যেন কোন বিপদ না হয়। ও অর্থাৎ সুকান্ত। একান্ত কাছের মানুষ। তার ভাল তো লেখার ভাল। তার সুখ লেখারও সুখ।

রান্নাঘর থেকে মা ডাকলো। লেখা দাঁড়ালো রান্নাঘরের দরজায়।

—আনাজগুলো একটু কুটে দেতো মা। অন্নদাব মা নেই, অশ্বিনীর বউটাও এলো না। কী জ্বালায় যে পড়িছি। পয়সা নেবার ব্যালা নেবে মাগীরা কাজের ব্যালাতে যত বাহানা। দোব সব দূর করে। দরকার নি অমন লোকের! দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোল ভাল।

মায়ের মুখের এই কথাগুলো প্রায় প্রতিদিনই নানা কারণে শুনতে হয় লেখাকে। স্বাভাবিক জীবন যাত্রার একটু এদিক ওদিক হলেই শুরু হয় অকাল বর্ষণ। বেশি পরিশ্রম হলেই ক্ষোভটা গিয়ে পড়ে নিরীহ অন্নদার মায়ের ওপর। অথবা অশ্বিনীর বউয়ের ঘাড়ে। অথচ ওদের না

হলে এক মুহূর্ত চলে না। চোখে সরষে ফুল দেখে। ওরা দু'দিন অনুপস্থিত থাকলে বাড়িতে লোক পাঠাবে। এলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। ওদের সামনে এত হাঁক-ডাক বন্ধ, মুখে কুলুপ, উল্টে তোয়াজ করবে। লেখার মনে হয়েছে—মা একটি আজব চরিত্রের মহিলা। মিউজিয়ামে রাখার মত।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পেতে বসলো লেখা। কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলছে সামনে। আলোর থেকে কালি ছড়াচ্ছে বেশি।

অনেকটা রাতে গলদঘর্ম হয়ে বাড়ি ফিরলো খগেন। সেই কোন্ সকালে মুখে দু'টো আধসেদ্ধ ভাত দিয়ে গিয়েছিল কোর্টে। ফিরতে একপো রাত। পাশের গ্রামের রায়েদের সাথে জমি নিয়ে মামলা চলছে কয়েকবছর। রায়েরাও খগেনের মত পয়সাওলা মানুষ। তুলনায় বেশিই হবে। পাটোয়ারী মানুষ। মামলাবাজও বটে। খগেন প্রথমে যত সহজে জিতবে ভেবেছিল এখন বুঝছে মামলাটা অত সহজ নয়। এবং রায়েরাও অত সোজা সরল নয়। বেশ লটপটাচ্ছে। কয়েক বছরেও মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে না। উপরন্তু বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলায় ফাঁসিয়েছে। বুঝতে পারছে রায়েরা সহজে ছাড়বে না। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। আজ ছিল মূল মামলার দিন।

দাওয়ায় বসে খগেন বললো—

—এক গ্লাস জল দেতো মা, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

রান্নাঘর থেকে বউ বললো—এখুনি তো এলে, জল খেউনি! সর্দি হবে! হাত পা ধুয়ে এসো। গায়ের ঘাম জুড়ুক। বাসকামিনী ধানের চিড়ে কুটিছি। পাটালি দিয়ে খাবেখন।

—না না। অগ্রে জল দে। তেষ্টায় মরে যাচ্ছি।

লেখা বঁটি কাত করে রেখে উঠলো। মা বললো—

—শুধু জল দিসনি। তক্তাপোশের নিচে বয়েমে পাটালি আছে একটুকরো দে।

জল পাটালি খেয়ে হাই তুললো খগেন।

—শালা ! সাতজন্মের পাপ না হলে কেউ মাওলা লড়ে।

রান্নাঘর থেকে ঝাঁজিয়ে উঠলো বউ।

—মাওলা করতে যাও কেন ? কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে মাওলা করো।

—এমনি কি যাই। জ্বালায় যাই। মাওলা না করলে গালে হাত উঠবে কী করে ? দোতলা বাড়িতে শোওয়া, চাষের টাটকা আনাজ। পুকুরের মাছ। ঘরের গোরুর দুধ খেয়ে তোমার ওই তুঁদরো গতর হলো কোত্থেকে ? সব ওই মাওলার জন্যে বুঝেছো। মেয়েমানুষ এ সবের বুঝবে কি। আস্কে খাও ফোড় গনো কোনদিন ? সবতো এই খগে শালা করে।

একটু দম নিয়ে পুনরায় বললো—

—সেই সকালে গেছি। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। সারাদিন বসে বসে। দুপুরের পর শালা পেশকার বললো—হাকিম আসবেনে। বোঝ ঠ্যালা। সাক্ষী সাবুদ নিয়ে গেলুম। গুচ্চের টাকার ছাদ্দ। সব দোরাস জলে গেল। এরই নাম শালা মাওলা, মরলেও ছাড়ে না।

—তুমি মরলে মাওলা তোমার সঙ্গে যাবে।

—যাবেই তো। জোর গলায় বললো খগেন। তা নাহলে ভুতো রায়কে ফাঁসাবে কোন্ শালা। সঙ্গে গিয়েও শালার সঙ্গে মাওলা লড়বো।

ফোড়ন কাটলো বউ।

—যদি নরকে যাও ?

—সেখানেও মাওলা করবো।

শরীরের ওপর ধকল গেলে রাতে ঘুম আসে না খগেনের। হাজার চিন্তার জটিল ফাঁসগুলো কিলবিল করে মগজের খোপে খোপে। আজো ঘুম আসছে না। বিছানায় উঠে বসলো। জানালায় তাকিয়ে রাতের বয়স বোঝার চেষ্টা করলো। না, বোঝা যাচ্ছে না। খাট থেকে নামলো শব্দ না করে।

— কোথায় চললে এখন ?

খগেন চমকালো। ভেবেছিল বউ ঘুমিয়েছে।

— বড় পুকুরের দিকে জাল ফেলার শব্দ শুনলুম। দেখি শালারা জাল টানছে কিনা।

পিতলবাঁধানো লাঠি হাতে খিল খুলে বাইরে বের হলো। স্ত্রীর উদ্দেশে বললো — খিল দিয়ে নেস, আমি এসে ডাকবোখন।

— ফিরবে কখন ? ঘুম জড়ানো কণ্ঠে জানতে চাইলো শ্রীমতী।

— দেরি হবে।

শ্রীমতী কথা বললো না। পাশ ফিরে শুলো। মধ্যরাতের ঘুম। এমনিতে সে বিরক্ত। সমস্ত দিন শরীর একটু আরাম পায়নি। ক্লান্ত শরীরে — কাঁচা-ঘুম। আগল বন্ধ করতেও উঠলো না। মধ্যরাতে খগেনের যাওয়া আসা তার গা সওয়া। মাঝে মধ্যে যায় খগেন। একঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, কোন কোনদিন পাঁচ ছ'ঘণ্টা পরেও আসতে দেখেছে। বিষয় সম্পত্তি থাকলে অনেক ঝামেলা। রাত বিরাতে এমন লক্ষ্য রাখতে হয়। পাহারা দিতে হয়। নাহলে পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে। শত্রু চারিদিকে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। যুবতী রাত। পায়ে চলা পরিচিত সরু পথ ধরে হন হন করে হাঁটছে খগেন।

আজ সন্ধ্যা রাতে জোয়ার। ভোর রাতে ভাটা লাগবে। অতএব নিশ্চিন্ত। হাতে সময় অনেক। যেদিন মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে সেদিন রাতে বের হয় খগেন। ওষুধ সেবন না করলে শান্ত হয় না শরীর। মন। তবে সব সময় সুযোগ থাকে না। যেদিন সুযোগ থাকে সেদিন রাতে বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়।

তিথি অমাবস্যা। রাতের রঙ বেশি কালো। লুঙ্গি তুলে কোমরে সেঁটে নিল। রবারের হাওয়াই নিল হাতে। চোরের মত নিঃশব্দে শিয়ালের সতর্কতায় চলছে খগেন। বড় পুকুরের ঈশান কোণ ঘুরে, রাঙচিতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে অশ্বিনীর ঘরটা নজরে পড়তেই সতর্ক হলো। থমকে দাঁড়ালো। বিস্মিত। এত রাতে অশ্বিনীর ঘরে আলো জ্বলে কেন ? জালে

যায়নে অশ্বিনী? অন্য কিছু? কয়েকটি প্রশ্নচিহ্ন দাঁড়ালো খগেনের সামনে। এরকম তো হয় না কোনদিন! হবার কথাও নয়। অশ্বিনী যদি জালে না গিয়ে থাকে তো সব মাটি।

ঘরের আলো জানালা টপকে কলাগাছের শরীরে চলকাচ্ছে। চকচক করছে। জানালার পাশের গাঁদাল গাছের লকলকে ছায়াটা কলাগাছের শরীরে প্রতিফলিত হয়ে সাপের মত হিল হিল করছে।

খগেন হতাশ হবার মানুষ নয়। অল্পে হতাশ হলে জীবনে ব্যর্থতাই আসে। অনেক ঝড় ঝাপটা, অনেক অনিশ্চয়তার মাঝে মাথা ঠাণ্ডা রাখে খগেন। সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়। নিশ্চয় কিছু ঘটেছে। এত রাতে অশ্বিনীর ঘরে আলো জ্বলার কথা নয়। তেল এত সস্তা নয় যে অশ্বিনীব বউ রাতভর আলো জ্বেলে ঘুমাবে।

অশ্বিনী দলুই। খগেনের বেনামদার প্রজা। বড় পুকুরের উত্তরে খানিকটা জমি দিয়ে তাকে বসিয়ে রেখেছে। ভাল লেঠেল। এককালে টাকা নিয়ে দাঙ্গা লড়তো। জায়গা দখলের লড়াইয়ে সে ছিল বল ভরসা। এখনো লাঠি ধরলে দশজনের সামাল দিতে পারে। কথা প্রসঙ্গে এখানো বুক ফুলিয়ে বলে—আমি নানু ঘোষের শিষ্য। রাতভর 'হাড়োয়া'* টানতে পারি।

অশ্বিনীর শরীর দেখে পছন্দ হয়েছিল খগেনের।

অশ্বিনী জাতে রাজবংশী। অন্য জেলার মানুষ। বন্যার বছর স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসেছিল কাজ কামের আশায়। অশ্বিনীর পেটানো শরীর দেখে ভাল লেগেছিল। একটা দৈত্য যেন গল্পের কাঠামো ভেঙে বেরিয়ে এসেছে হঠাৎ। দাঁড়িয়েছে সামনাসামনি।

খগেন ভেবে দেখলো এরকম একটা মানুষ হাতে থাকলে অনেক লাভ। অনেক বল ভরসা। প্রয়োজনে লাঠি ধরে প্রাণ বাঁচাবে মনিবের। এ প্রকৃতির মানুষরা নিমক খেলে নিমকহারামি করে না। এদের ওপর

---

* লাঠিখেলার ভঙ্গি পদ্ধতি

ভরসা রাখা যায়। নির্ভর করা যায়। সেদিন অভিজ্ঞতায় মানুষ চিনেছিল খগেন। বড় পুকুরের উত্তরদিকে অনাবাদী কাঁকুরে জমি কাঠা পাঁচেক বাস করতে দিয়েছে অশ্বিনীকে। মাঝি করে দিয়েছে একটা নৌকার। গায়ে গতরে একটা চালা খাড়া করে নিয়েছে মাথা গোঁজার।

অশ্বিনী খগেনের বদান্যতায় কৃতজ্ঞ। বিপদের দিনে যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সেই তো প্রকৃত বন্ধু। আপনজন। কত্তা নতুন জীবন দান করেছে। কত্তা তার কাছে দেবতা। এমন মানুষ হয় না। ওই মানুষটার জন্যেই দুটো খেয়ে পরে বেঁচে আছে।

ইলিশের মরশুমে সে ইলিশ ধরে। 'শুকো' 'শেলেতে'ও যায় খগেনের নৌকা নিয়ে। অশ্বিনীর বউ কাজ করে খগেনের বাড়িতে। বাসন মাজে। খড় কুঁচোয়। গোরুকে জাবনা দেয় কাপড় কাচে।

অশ্বিনীর ঘরে আলো দেখে সামনে না গিয়ে গেল পেছনে। জানালার জাফরিতে চোখ রাখলো। না, তেমন কিছু নয়। ঘরের কোথাও অশ্বিনী নেই। জালে গেছে নিশ্চয়। কুলুঙ্গিতে লম্ফ জ্বলছে। মেঝেতে খেজুর পাতার চ্যাটাই পেতে ঘুমাচ্ছে অশ্বিনীর বউ। ভাল করে ঘরের ভেতরটা নিরীক্ষণ করলো খগেন।

— মাগী আলো নেভাতে ভুলে গেছে।

পায়ের শব্দ না করে খগেন গিয়ে দাঁড়ালো বন্ধ দরজার সামনে। লাঠি দিয়ে দরজায় শব্দ করলো। কোন প্রত্যুত্তর এলো না ঘরের মধ্যে থেকে। শুধু চ্যাটাইয়ের মচমচ শব্দ শুনলো খগেন।

পুনরায় লাঠি দিয়ে আগড়ের দরজায় শব্দ করলো। ঘুম ভাঙলো ভেতরের মানুষটার।

— কেরা। ড্যাকরা মিন্‌সে।

পুনরায় শব্দ করলো খগেন।

— কোন্ খান্‌কির ব্যাটারা?

চাপা গলায় খগেন বললো — আমি।

ভেতরে আর শব্দ হলো না। পরিবর্তে শোনা গেল দরজা খোলার শব্দ। তারপর ফিসফিসিয়ে ঘরের ভেতর থেকে কেউ বললো — কত্তাবাবু?

— হুঁম।

আগড়ের দরজা একটু ফাঁক হলো। ঘরের মধ্যে ঢুকলো খগেন। বন্ধ হলো দরজা। ফুঁ দিয়ে কুলুঙ্গির লম্ফটা নিভিয়ে দিল অশ্বিনীর বউ।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরে গেল ঘর।

রাত তখন গহিন।

সুনশান্।

রাতের শরীর লেহন করছে ভাগাড়ের শিয়াল।

খগেন চলে গেলে, খগেনের বউ সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো খিড়কির দরজার কাছে।

প্যাঁচার ডানায় বইছে রাতের বাতাস।

ঘন অন্ধকার পাক্‌সাট মারছে রাতের শরীরে। একটা রাতপাখি চিৎকার করলো কাছেই কোথাও।

গোলার পাশ ঘুরে শ্বাপদসতর্ক পদক্ষেপে অন্ধকারে এগিয়ে চলে খগেন জানার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। শ্রীমতী।

কোথায় যায়?

গোলার পাশে যে ছোট ঘরে থাকে মাহিন্দার উমেশ মোড়ল। সেই ঘরের দরজায় শব্দ হলো। আস্তে। ভেতরের মানুষ প্রস্তুত হয়েই ছিল, নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। অন্ধকারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো আগন্তুক।

ভোর রাতে ক্লান্ত শরীর টেনে এনে এলিয়ে দিল বিছানায়।

তখনো খগেন ফেরেনি।

একঘুমে সকাল হয়।

অনির্বচনীয় তৃপ্তিসুখ মেখে ঘুম ভাঙে শ্রীমতীর। খোঁয়াড়ের মোরগটা তখন 'বাঙ' দিচ্ছে। রাত্রি শেষের লগ্ন ঘোষণা করছে সোচ্চারে।

বিস্মিত হলো কালীপদ।

অনেক রকম শ্রেণীবিন্যাস করা যায় বিস্ময়ের। আজকের বিস্ময়ের সাথে তুলনা করা চলে সেই আদিম যুগের। যেদিন মানুষ প্রথম আগুন দেখেছিল। অথবা আগুনকে নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছিল। মানুষ সেদিন বিস্মিত হয়েছিল আগুন দেখে। আগুনের প্রচণ্ড ক্ষমতা দেখে। তার বাহারি রঙ দেখে।

কালীপদ বিস্মিত হলো রাধাকে দেখে। আদিম মানুষের আগুন আবিষ্কারের দৃষ্টিতে দেখলো। সূর্য তখন কালীর ঘরের পেছনে বাঁশ ঝাড়ের জটিল জাফরিতে জড়িয়ে গেছে। বিকালের ভিজে বাতাস বইছে এলোমেলো। রসা রসা গন্ধ বাতাসের শরীরে।

আজ জালে যায়নি কালী। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না গত দু'দিন, কাল বিকালে জ্বর হয়েছিল। সকালেও ছিল অল্প। আজ বিকালে অবশ্য জ্বর অনুভব করছে না।

দুপুরের পর গিয়েছিল মোহনপুর হাটে। সংসারের দু'একটা জিনিসের সাথে মিহিলাল ডাক্তারের দু'পুরিয়া ওষুধ এনেছে। আশা আগামীকাল জালে যেতে পারবে।

রাধাকে ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে দেখে চমকালো কালী। রাধা এখানে! এই অসময়ে! তার মত বেরো বাউণ্ডুলের ঘরে রাধা আসতে পারে এ কল্পনাকে অনেক অনুসন্ধান করেও মনের কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। তবে রাধার কোন বিপদ?

—রাধা।

নিজের ডাককেই অচেনা মনে হলো। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক পর্দায় থাকলো না। আতঙ্কের কম্পন ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। রাধাকে দেখে উল্লসিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা পারছে কই? রাধার অমঙ্গল আশঙ্কায় কালীর বুকের ভেতরটা কাঁপছে।

ভালবাসা অকারণে অমঙ্গল আশঙ্কা করে?

অবনত মস্তকে বসে আছে রাধা। কালীর ডাকে তাকালো মুখ তুলে। অশ্রুসিক্ত চোখ দু'টো মেলে ধরলো কালীর সামনে। অশ্রুর আয়নায় ফুটে উঠলো বহুবর্ণের বিচিত্র লিপি। যা পাঠোদ্ধার করতে বিলম্ব হলো কালীর। এতক্ষণ রাধা হয়তো একান্তে, আপন বুকের গভীরে ডুব দিয়ে অনুসন্ধান করছিল অতীতের পরিচিত কোন ছবি। অথবা বর্তমানের। ভবিষ্যতের ছবিও হয়তো খুঁজছিল গোপনে গোপনে।

কালীকে সামনে দেখে এলেমেলো হয়ে গেল সাজানো পুতুলঘর। প্রচণ্ড গর্জনে চোখের সামনে ধসে পড়তে থাকলো হিমালয়ের আকাশ ছোঁয়া তুষার শৃঙ্গগুলো। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে উঠলো ছবি। নিকটে থেকেও কালীকে দেখছে বহু দূরের। ছায়া ছায়া অবয়ব।

—রাধা। পুনরায় ডাকলো কালীপদ।

রাধার কানে দূরাগত মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মত শোনালো কালীর ডাক। নিশীথ রাতে পথহারা পথিককে ওই ঘণ্টাধ্বনি যেন নিজের বক্ষে আশ্রয় দেবার জন্যে আহ্বান করছে—এসো এসো এসো। দু'হাত প্রসারিত করে রাধা অবলম্বন হিসাবে কিছু ধরতে গিয়ে বৃন্তছেঁড়া ফুলের মত লুটিয়ে পড়লো কালীর পায়ের কাছে।

প্রায় দশ বছর পূর্বে এক চৈতালি সন্ধ্যায়, একটা বালিকার হাত ধরে দেশে ফিরেছিল নোটন গোঁসাই।

গ্রামের মানুষ ভীষণ অবাক হলো সেদিন। সবার মনে প্রশ্ন জাগলো—নেটো বোষ্টমের নতুন কোন্ রঙ্গ ?

ঘর ছাড়া বাউণ্ডুলে বোষ্টম। বছরের আর্ধেক দিন দেশে থাকে না। একতারা হাতে ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশে। নিরু বোষ্টমীর মৃত্যু তাকে বিবাগী করেছে। ঘর থেকে পথে নামিয়েছে। সে সময় অনেকে বলেছিল—তুমি আবার কণ্ঠিবদল করো নোটন।

পরিবর্তে ঘর ছেড়েছিল নোটন। আসলে আখড়ায় তার মন বসছিল না। সর্বত্র নিরুর হাতের ছাপ। জ্বল জ্বল করছে। শোক ভুলতেই হয়তো

সেদিন পথকে অবলম্বন করেছিল। কিন্তু পথের দূরত্ব শেষ হতে তিনবছর পর নোটন দেশে ফিরেছিল। আখড়া তখন ভেঙে পড়েছে। রাসমঞ্চে আগাছার জঙ্গল। শুধু উঠোনের কদম গাছটা ছিল ভর ভরন্ত যুবতী।

গ্রামের মানুষ ভাবলো নোটন এবার হয়তো থিতু হবে। পুনরায় আখড়া খুলবে। পরিচিত কারো সাথে কন্ঠিবদল করবে। না, তা করলো না। আখড়া মেরামত করলো। প্রাঙ্গণের আগাছা সাফ করলো। তারপর একদিন দরজায় তালা চড়িয়ে পথে নামলো। প্রতিবেশীর বিস্মিত দৃষ্টি দেখে নোটন বললো — নিরু শান্তিতে থাক।

আসলে নিরুর স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফিরছে নিয়ত।

এরপর থেকে বছরে দু'একবার দেশে ফিরতো। দু'একদিন থেকে, আখড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পুনরায় পথে নামতো।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় লাল ফ্রক পরা বছর দশেকের এক বালিকার হাত ধরে গ্রামে ফিরলো নোটন। হাতে চিরপরিচিত সেই একতারা।

— নোটন দেশে ফিরলে তাহলে?

হাসলো নোটন। বললো — গোবিন্দের ইচ্ছা।

মুরুব্বি মানুষ কিনু মোড়ল বললো —

— মেয়েটিকে কোথা থেকে জোটালে হে গোঁসাই?

— সবই কেষ্টর ইচ্ছা। তিনিই জুটিয়ে দিলেন মোড়ল মশাই।

— আবার কি আখড়া খুলবে?

মেয়েটিকে দেখিয়ে নোটন বললো —

— আমার রাইকিশোরী রাধার যদি ইচ্ছা হয় — হবে।

গ্রামের মানুষ দেখলো নোটনের রাধাকে। ঢ্যাঙা ছিলছিলে শরীরের মেয়ে। ফর্সা রঙ। ডাগর ডাগর দুটো চোখ। মাথা ভর্তি একরাশ কটা চুল। সামনের একটা দাঁত বাঁকা। হাসলে, কথা বললে ভাল দেখায়। পড়শিরা বললো — সারাজীবন তো পথে পথে ঘুরলে। বৃদ্ধ বয়েসে একটু থিতু হও। আখড়া খোল। পারলে কন্ঠিবদল করো।

নোটন হাসলো প্রত্যুত্তরে। রহস্যময় হাসি।

ভালবাসার টান ভীষণ টান। পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্দান্ত জঙ্গি শাসকরাও ভালবাসার কাছে পরাজয় মেনেছে বার বার। জঙ্গি সেনানায়করা ভালবাসার জন্যে রণাঙ্গনে হাতিয়ার ত্যাগ করেছে।

ঘরছাড়া নোটন গোঁসাই হার মানলো ভালবাসার কাছে। একরত্তি ওই মেয়ে বাঁধন ছেঁড়া গোঁসাইকে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করলো অবলীলায়। এখন হঠাৎ হঠাৎ আখড়ায় তালা ঝুলিয়ে পথে নামতে পারে না। সামনে এসে দাঁড়ায় কিশোরী রাধা। ডাগর ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকে। সত্যি ওই দুচোখে কী মায়া যে ধরে রেখেছে মেয়ে। সবকিছু গোলমাল হয়ে যায় নোটনের। বিস্মরণ হয়ে যায় সবকিছু। মাঝে মাঝে তাই আক্ষেপ করে নোটন — কেষ্ট, তুমি আমাকে এ কী বাঁধনে বাঁধলে। ঘর ছাড়া বিবাগী মানুষের স্কন্ধে কেন চাপিয়ে দিলে প্রভু এ নারীরত্ন। আমি যে অক্ষম। কেমন করে বইবো তোমার দেওয়া দায়িত্ব। এখন আমি কি করবো বলে দাও ঠাকুর।

নোটন বুঝতে পারে না গোবিন্দের কি ইচ্ছে।

— আমি বুঝতে পারছি ঠাকুর তুমি পরীক্ষা করছো। তোমাকে যাতে ভুলে থাকতে পারি। তুমি তাই পাঠিয়েছো রাধারানীকে ছলনা করতে। ঠিক আছে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক গোবিন্দ।

নোটনেব কথার উত্তর দেয় না রাধাবল্লভ। কিন্তু দিন দিন তিল তিল করে পরিপূর্ণ হচ্ছে রাধা। অদৃশ্য বন্ধনের রজ্জু ধীরে ধীরে চেপে বসছে নোটনের গলায়। ভালবাসার মোহজালে বন্দী হয়ে পড়ছে। রাধাকে যত দেখছে তত বিস্মিত হচ্ছে নোটন। এ মেয়ে তো সাধারণ মেয়ে নয়, অন্যের থেকে অন্য। অনন্য। এই একরত্তি মেয়ে — বালিকার সীমা অতিক্রম করেনি এখনো। সে কিনা জীবনের আমূল পরিবর্তন করে দিল। পথের মানুষকে ঘরে বাঁধলো। জীবনের ছেঁড়া তারে নতুন করে সুর বাঁধতে প্রেরণা দিচ্ছে।

নিরু বোষ্টমীর মৃত্যুর পর যে আখড়া ধ্বংস হয়ে টিকে ছিল শুধু কংকাল। সেই অস্থি পিঞ্জরে রক্ত মেদ, শেষে প্রাণ সঞ্চার করলো মমতা

মাখা ছোট দু'টি হাতের স্পর্শে। নিকিয়ে মুছিয়ে তকতকে করে রেখেছে আখড়া। উঠোন। কদমগাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করে তৈরি করেছে তুলসীমঞ্চ। বেড়ায় লাগিয়েছে নীল অপরাজিতার লতা।

দু'মাসের মধ্যে আখড়ায় পরিবর্তন দেখে পড়শিরা নয়, নোটন নিজেও বিস্মিত। এই মেয়ের এত ক্ষমতা! আহাঃ নিরু আজ থাকলে কি খুশি না হতো। তার হাতে তৈরি, প্রাণের আখড়া পূর্বের মত ঠিক ঠিক আছে!

এখন কানু গোসাইকে মনে পড়ছে। মৃত্যুর আঙিনায় পা রেখে দু'টো হাত ধরে বলেছিল—

—নোটন, ভবপারের ডাক শুনতে পাচ্ছি। গোবিন্দ আমাকে ডাকছেন। তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি আমার রাধারানীকে। ওকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম বিষণ্ণ এক দুর্যোগের রাতে। ও ছদ্মবেশী রাধা-রানী। অমর্যাদা করো না। সব জানবে গোবিন্দের ইচ্ছা। তোমার ভাল করবেন শ্রীমধুসূদন।

এখন নোটন উপলব্ধি করছে কানু গোঁসাইয়ের দূরদর্শিতা।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় নোটন গোঁসাইয়ের আখড়ায় গানের আসর বসে নিরু বোষ্টমীর আমলের মত। কেরোসিনের ম্লান আলো ঘিরে গোল হয়ে বসে গ্রামের কিছু ভক্ত রসিক মানুষ। কৃষ্ণলীলাব অপার মহিমা তাঁদের চোখ অশ্রুসজল করে।

নোটনের ভাঙা আখড়া দেখে তারা এতকাল কিছু একটা হারানোর হাহাকার অনুভব করতো বুকের গভীরে। কিসের যেন অসম্পূর্ণতা ককিয়ে কাঁদে ঠা-ঠা রোদ্দুরে। বৈশাখের ক্লান্ত দুপুরে ঝোড়ো বাতাস যখন হা-হা কেঁদে বেড়ায় ভাঙা আখড়ার আনাচে কানাচে, তখন বিশাল শূন্যতা পাক্‌সাট মারে ভক্ত মানুষগুলোর বুকে। কী যেন নেই। কী যেন ছিল হারিয়ে গেছে। স্মৃতির আলোয় তারা দেখে নিরু বোষ্টমী দাঁড়িয়ে আছে কদমগাছের ছায়ায়। ললাটে রসকলি। কণ্ঠে কণ্ঠি। পানের রসে রাঙানো

হু'টো ঠোঁট। দক্ষিণী বাতাসে বসন্তের রঙ বইছে এলোমেলো সাঁই সাঁই। রুক্ষু চুলের ঝাপটায় মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে তার দীঘল চোখ। টিকালো নাক। মুখে রহস্যময় হাসি। আমন্ত্রণের চটুল ইঙ্গিত চোখের তারায়।

খঞ্জনি নিয়ে বসে রাধা। সুরে সুর মেলায়। নোটনের কণ্ঠ বড় মিষ্টি। একাত্ম হয়ে যায় গানের মধ্যে। ভক্তিতে, ভাবাবেগে চোখে জল ঝরে। নোটনের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায় রাধা। সুরেলা নারী কণ্ঠ গানকে আরো সুন্দর, সুষমামণ্ডিত আরো শ্রুতিমধুর করে। ভক্ত রসিক মানুষগুলোর বুকের গহনে তুফান ওঠে।

সব রসেই গান গায় নোটন। তবেই তো রসিক নাগর খুশি হবে। নিজে গান বাঁধে। সেই গানে সুর দেয়।

নোটন হচ্ছে জাত বোষ্টম। অদি নিবাস বীরভূম জেলা। বৈষ্ণবী রক্ত নোটনের শিরায় শিরায় বহমান। বাপের নেশা নোটনের মধ্যেও সংক্রামিত। ঘরছাড়ার নেশা। তবুও বাপের সাথে তার ফারাক অনেক। বাপ মাধুকরিতে বের হতো করতাল নিয়ে। নোটন বের হয় একতারা নিয়ে। আসলে সে মাটির মানুষ। বীরভূমের মাটির প্রভাব এড়াতে পারেনি। বাউল আর বোষ্টমের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে তার জীবনদর্শন।

ঘরছাড়ার নেশা তাকে তাড়িয়ে এনে ভিড়িয়েছিল বিষ্টুপুরের চরে। এখানে কোন এক বর্ষালি সন্ধ্যায় সমাজতাড়িতা অন্ত্যজ নিরুকে নিয়ে আখড়া খুলেছিল। ইচ্ছা ছিল থিতু হবে। অনেক স্বপ্ন এঁকেছিল ভবিষ্যতের শাখা প্রশাখায়।

এখানকার মানুষগুলো পেশায় মাছমারা। গরীব। কিন্তু তারা প্রশস্ত বক্ষ বাড়িয়ে আশ্রয় দিয়েছে ঘরছাড়া ছন্নছাড়া হু'টো মানুষকে।

বড় আপন এই গ্রামের মানুষগুলো।

গ্রামের শেষ প্রান্তে নদীর পাড়ে সেদিন আখড়া বানিয়েছিল নোটন। ইচ্ছা ছিল জীবনের শেষ ক'টা দিন এখানে কাটাবে নিশ্চিন্তে। নিরিবিলিতে।

নোটন গোঁসাইয়ের আখড়ায় আলো দেখে কালীপদর চলমান পা ত্ন'টো থমকে দাঁড়ালো। এখানে আলো! গোঁসাই কি গ্রামে ফিরেছে!

অতীতদিনের জ্বলন্ত একটা স্মৃতি মনের পর্দায় চলকে উঠলো।

বয়স তখন বারো। নোটন বোষ্টমের আখড়ায় গান হচ্ছে। মুগ্ধ শ্রোতাদের মধ্যে বসে আছে এক কিশোর। অবাক বিস্ময়ে গান শুনছে। কখনো একক কণ্ঠের, কখনো বা নিরু-নোটনের দ্বৈত কণ্ঠের। মনের পর্দায় তখন আগামীদিনের অস্পষ্ট একটা ছবি ধীরে ধীরে অবয়ব গ্রহণ করছে— বড় হলে বোষ্টম হবে। আখড়া তৈরি করবে নিরিবিলিতে। সকাল সন্ধ্যায় গান গাইবে। সঙ্গে গাইবে নিরু বোষ্টমীর মত কেউ একজন।

দিন দিন বয়স বেড়েছে কিশোরের। ইচ্ছার ছবিটা স্পষ্ট হয়েছে।

এরপর হঠাৎ নিরু বোষ্টমীর মৃত্যুতে সব ছবি ওলটপালট হয়ে গেল কিশোরের মনের নীল পর্দা থেকে। গোঁসাই সব ছেড়ে ছুড়ে পথে নামলো। আখড়া ধ্বংস হলো কালবৈশাখীতে। উঠোনে জন্মালো আগাছার জঙ্গল। সরীসৃপের অবাধ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো সেখানে।

কালীপদ গিয়ে দাঁড়ালো আখড়ার প্রাঙ্গণে। ত্ন'চোখে বিস্ময়। পরিবর্তন হয়েছে আখড়ার, পরিবর্তন হয়েছে মানুষের।

—কে? কে ওখানে? থেমে গেল একতারার শব্দ।

—আমি কালীপদ।

—কালীপদ? স্মরণ করার চেষ্টা করলো নোটন। কে এই কালীপদ। কে এই যুবক।

—তুই কেশবের ব্যাটা?

—হ্যাঁ গো গোঁসাই।

নোটন চিনলো কালীকে। সেদিনের সেই কিশোর আজ পরিপূর্ণ যুবক।

—বোস। আহ্বান করলো গোঁসাই।

কালী নির্বাক। বিস্ময় ধোয়া দৃষ্টিতে দেখছে সেদিনের স্মৃতিকে। নোটনকে। কণ্ঠে কণ্ঠি আছে। গেরুয়া বসন আছে। কিন্তু আমূল পরিবর্তন হয়েছে মানুষটার মধ্যে। সেই রূপ নেই। সেই যৌবন নেই। মাথার চুল পেকেছে। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। বিধ্বস্ত একটা মানুষ। ভাঙাচোরা একটা অস্তিত্ব।

গান পাগলা ছেলে কালীপদ। নিজে গান বাঁধে। কিশোর বয়েসের সুপ্ত ইচ্ছাটাই হয়তো গান হয়ে ধরা দেয় তার কণ্ঠে। সেকালের স্বপ্ন হয়তো একাই পূর্ণতা পেতে চায়। প্রতি সন্ধ্যা কালীকে দুর্বার আকর্ষণে টানে নোটন গোঁসাইয়ের আখড়া। সন্ধ্যার মিহি আঁধার যখন স্বপ্নিল আঁচল পেতে আহ্বান করে রাত্রিকে। কালী পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ায় আখড়ার দরজায়। নোটন গায়। হৃদয় নিঙড়ে দুঃখের পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়ে। সঙ্গে গায় রাধা। কালী দেখে দু'জনকে।

মেলে না। মেলে না। কিশোরকালের ছবির সাথে মেলে না। এ ছবি অন্য ছবি। ভাল লাগে রাধার কণ্ঠ। বড় মিষ্টি, বড় সুরেলা। মাঝে মাঝে রাধার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায় কালী। শ্রোতারা উৎসাহ দেয়। বাহবা দেয়। তারিফ করে।

বয়স বাড়ছে পৃথিবীর। তিল তিল করে বাড়ছে রাধা। সূর্যমুখীর মত পাপড়ি মেলছে। চোখের আয়নায় ছায়া খেলছে নীল আকাশের। যৌবন সরসী পূর্ণ হচ্ছে ধীরে ধীরে। স্বচ্ছ বারিতে ভরে উঠছে কানায় কানায়। সতেজ লতার মত বাড়ছে দিন দিন।

হালে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে নিজের মধ্যে হারিয়ে যায় কালী। দাঁড়িরা অবাক হয়। কালী কি বিবাগী হয়ে যাবে? নোটন গোঁসাইয়ের মেয়ে ওর মাথা খাচ্ছে। রাক্ষুসী ডাইনি। কালীকে বললে হাসে মন্তব্য করে না।

নতুন নতুন গান বাঁধে কালী। সেই গানে সুর দেয় নোটন। গায় তিনজন। কখনো উপস্থিত সবাই।

এই আখড়ায় কালী দেখেছে নিরু বোষ্টমীকে। মনের মণিকোঠায় সে-স্মৃতি আজ আর স্পষ্ট নয়। ছায়া ছায়া অবয়ব। ফিকে রঙের কিছু এলোমেলো আঁচড়। এখন নিরু নেই। সামনে বসে রাধা। চুল চূড় করে বাঁধা। ললাটে রসকলি। কণ্ঠে কণ্ঠি। দু'হাতে কয়েকগাছা রেশমি চুড়ি, পরনে লাল ডুরে শাড়ি। লাল ব্লাউজ। স্বর্গের পথ বেয়ে যেন সবেমাত্র পৃথিবীতে নেমে এসেছে সুরের দেবী। কালী গান গায়। দৃষ্টির বাতাস লাগে রাধার অঙ্গে। আহাঃ রাধা বড় সুন্দর! বড় সুন্দর!

মন-পাখিটা বলে রাধা বড় সুন্দর। ঈশ্বর যেন পৃথিবীর সব সৌন্দর্য নিঙড়ে গড়েছে রাধাকে। মাঝে মাঝে কালীর মনে হয়েছে রাধা এত সুন্দর কেন? তবে কি অন্য কোন অভিপ্রায় আছে ঈশ্বরের।

কালী যখন অনেক কথা ভাবছে।

—রাধা তখন একাগ্র সাধিকার মত সাধনায় মগ্ন।

ফাল্গুনী সন্ধ্যা। তিথি পূর্ণিমা। গোলাকার চাঁদ থমকে আছে কদমগাছের ডালে। টানা বাতাস বইছে এলোমেলো। নিমফুলের মিষ্টি গন্ধে পরিবেশ উন্মন। আখড়ার প্রাঙ্গণে কদমগাছের নিচে চ্যাটাই পেতে বসে আছে রাধা। আজ গরহাজির অন্য শ্রোতারা। হাটবার, কেউ গেছে হাটে। পাশের গাঁয়ে তরজার আঁসরে কেউ কেউ। কালী গিয়ে দেখলো শ্রোতাহীন আখড়া। একা বসে আছে রাধা। নদীর পাগল বাতাস এলোমেলো করে দিচ্ছে তার মুক্ত কেশের অরণ্য।

—আজ কেউ আসেনি?

—না। মাথা নাড়লো রাধা।

—গোঁসাইজী? রাধা হাসলো। আঁচলে শরীর ঢেকে বললো—নেই। হাটে গেছে।

আজ সবকিছু ওলোট পালোট। গোঁসাই নেই। রাধা একা। কালী অস্বস্তি বোধ করছে। সব মানুষ সমান নয়। কে কোথায় মন্দ রটাবে। সেদিক থেকে কালীর ভয়ের কারণ নেই। সে পুরুষ। পিচ্ছল শরীরের

চামড়া। সব অপবাদ পিছলে যাবে। চরিত্রে ছন্নছাড়া। বাউণ্ডুলে। না আছে আত্মীয় স্বজন, না আছে সমাজের বন্ধন।

কালী জানে ইতিমধ্যে রাধাকে নিয়ে অনেক কথা চালাচালি হচ্ছে। অনেক কানাকানি গ্রামের মধ্যে। নোটন গোঁসাই কোথা থেকে তুলে এনেছে মেয়েটাকে। ব্যবসা করছে। সাধন ভজনের নামে বেলেল্লাপনা করছে। মাথা খাচ্ছে উঠতি ছোঁড়াদের। মেয়েটার চরিত্র ফরিত্র ভাল নয়, দিনরাত ঢলাঢলি করছে।

গোঁসাইয়ের গোচরে আছে সব কিছু। বিশ্বাস করে না।

হেসে উড়িয়ে দেয়। প্রত্যুত্তরে বলে—

শ্রীমতীর যদি কলঙ্ক না লাগে আমার রাধারানীরও লাগবে না। ও সব মন্দ লোকের রটনা।

কালীও বিশ্বাস করে মন্দ লোকের রটনা। পৃথিবীতে ভাল মানুষ ক'টা পাওয়া যায়? পোশাকে শরীরে মানুষের মত হলেও মানুষ কিন্তু সবাই নয়। কেউ কেউ মানুষ। মানুষের এই অরণ্যে বেশির ভাগ মন্দ লোকের দলভুক্ত।

কালী সংযত করে নিজেকে। অহেতুক অন্যের আলোচনার উপাদান নাইবা হ'লাম। তার ভাবনা রাধাকে নিয়ে। মন্দ রটলে কালীর কিছু এসে যায় না। রাধা যুবতী। কিছু রটলে সেটা হবে কলঙ্ক। হাজার সাবানে কাচলেও সে কলঙ্ক যাবে না।

—আমি আজ আসি রাধা।

হঠাৎ কালীর একটা হাত চেপে ধরে রাধা বললো—

—আমি একা আছি। একটু বসো না। দু'টো কথা বলি।

লজ্জায় পড়লো কালী। মনের দৈন্যতা কি বুঝতে পারলো মেয়েটা! অথবা হৃদয়ের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়লো! সত্যি তো যাদের সাথে এতদিনের সম্পর্ক। এভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায়? গেলে সেটা হবে অমানবিকতা। অসামাজিকতা। তাছাড়া রাধা যুবতী। রাতের অন্ধকারে অন্যভাবে আক্রান্ত হতে পারে।

কালী বসলো রাধার পাশে। রাধার খোলা চুলের মিষ্টি গন্ধ লাগছে কালীর নাকে। কালীর ইচ্ছা করছে রাধার খোলা চুলের অরণ্যে মুখ ডুবিয়ে বুক ভরে গন্ধ নেয়। সব নারীর চুলের গন্ধ কি এমন মিষ্টি? সব নারী কি রাধার মত মিষ্টি! না, অন্য কে কেমন কালী জানে না। জানার কথাও নয়। এমনি করে কোন যুবতীর সন্নিকটে বসেনি ইতিপূর্বে।

রাধা অনিন্দিতা। অনন্যা। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল। পাহাড়ি ঝর্নার মত উচ্ছল।

পাশাপাশি বসে দু'জন মানুষ। কালীপদ—রাধা। রাধা দেখছে পূর্ণিমার আকাশ। কালী দেখছে রাধাকে।

সন্ধ্যার বয়স বাড়ছে। জ্যোৎস্নার ওড়নায় ঢাকা গ্রামজনপদ। ছায়া ছায়া অন্ধকার। কদমগাছের পাতায় পাতায় আন্দোলিত হচ্ছে বসন্তের বাতাস। ঝিল্লির ঐকতান ইতস্তত। দূরে কোরাস গাইছে রাত প্রহরী শেয়ালের দল। জোনাক জ্বলছে ঝোপে ঝাড়ে। আশশ্যাওড়ার বনে। কদমপাতার জাফরি গলে জ্যোৎস্না আল্পনা আঁকছে আখড়ার প্রাঙ্গণে।

দু'টো মন দু'টো হৃদয়, দু'টো মানুষ বসে আছে নীরবে। কি দিয়ে শুরু করবে আলাপ সেই বাণী খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। অথবা এখানে প্রয়োজন নেই বাণীর। আলাপ এখানে গৌণ। মনের কথা মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছে দু'জনে। নিজের নিজের মধ্যে নিরুদ্দেশ। একে অন্যের মনের লিপি পাঠোদ্ধার করছে হৃদয়ের কম্পনে।

নদীর বাতাস খেলা করছে রাধার চুল নিয়ে।

রাতের বয়স বাড়ছে।

জ্যোৎস্নার আল্পনা স্থান পরিবর্তন করছে।

কালী ডাকলো—রাধা।

—উঁ।

দূরে কাঠমল্লিকার ঝোপে জোনাক জ্বলা দেখছিল সে।

—কি ভাবছো?

—কৈ। কিছু ভাবছি না তো।

—অনেক রাত হলো। আজ উঠি।

—উঠবে ?

হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থের মত হাসলো রাধা। কালীর হাত চেপে ধরলো।

—তুমি আচ্ছা বোকা মানুষ তো। এমন সুন্দর রাত। এমন সুন্দর চাঁদ। তুমি চলে যাবে ? বসো।

কালীর হাত ধরে বসালো রাধা। রাধার হাতে কালীর হাত। সময় চলে। অন্ধকারের পাখায় ভর দিয়ে রাত বাড়ে। চাঁদ সরে সরে যায়। রাত পাখি ডাকে।

ফাল্গুনের পাগল বাতাস হামলায় কদমগাছের ডালে।

রাতভর বৃষ্টি হয়েছে। সাঁই সাঁই বাতাস ছুটেছে। অকাল বর্ষণে গ্রামের মেঠো পথ কাদায় পিচ্ছিল হয়ে উঠলো।

উপেন নাটি এ তল্লাটে নামকরা গুনিন। ওঝা। হেন কাজ নেই তার অসাধ্য। একেবারে ধন্বন্তরি। সাপে কাটলে ঝাড়ফুঁক করে। ব্রহ্মজ্বাল করে বিষ নামায়। ভুতে ধরলে সরষে পড়ে, ঝাঁটা মেরে ভূত তাড়ায়। জল পড়া। নুন পড়া, তেল পড়া, চুন পড়া দেয়, হাত ধোয়। ওষুধ দেয়। লোকে বলে শব সাধনা করে দু'টো ভুত পেয়েছে উপেন। তাদের সাহায্যে অসাধ্য সাধন করে। ইচ্ছা করলে উপকার করতে পারে। না চাইলে চরম ক্ষতি করতে পারে। 'বাণ' মেরে মানুষ মারতে পারে। শরীরের ক্ষতকে 'ভেরে' দুরারোগ্য করতে পারে। মন্ত্রের দ্বারায় রান্নাভাতকে চাল করে দিতে পারে। রাতের আঁধারে গাছপালা মানুষজন উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। কেউ কেউ এমন দাবি করেছে উপেনকে গাছ উড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে। অনেকে দেখেছে গভীর রাতে শ্মশানে 'চাতুরি' করতে। রাত সাধনার অন্যতম পদ্ধতি হলো চাতুরি। নিম্ন মস্তক, উর্ধ্বপদে দু'ই হস্তের সাহায্যে চড়ে বোড়ানো। তখন হয় সর্বভুক। শ্মশানের নোংরা ময়লা। পচা গলা শবও সুখাদ্য হয়। গ্রামের মানুষ ভয় করে উপেনকে, অনেক গুণের জন্যে ভালও বাসে। শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

ভোর রাতে নোটন গোঁসাইয়ের মেয়েকে দেখে বিস্মিত হলো উপেন। বিপদে না পড়লে মানুষ এত সকালে তার কাছে আসে না।

—কী গো মা জননী। এত সকালে আমার দুয়ারে?

রাধা জানালো সন্দেহের কথা। কাল বর্ষা বাদলের রাতে ফেরার পথে কি যেন কামড়েছে পায়ে। তখন গুরুত্ব দেয়নি। কত জাতের পোকা-মাকড় আছে পৃথিবীতে। অত ভয় করলে চলে? কিন্তু ভোররাতে শরীরের রঙ বদল ঘটেছে। মুখ দিয়ে গ্যাজলা বের হচ্ছে। ঝিমধরা ভাব, কথা বলতে পারছে না।

—চলো মা চলো। যত আগে যেতে পারবো তত ভাল।

ছোট একটা চটের থলেতে যাবতীয় উপকরণ ভরে নিয়ে উপেন নাটি পথে নামলো রাধার সাথে।

খগেন জানার বৈঠকখানার সামনে দিয়ে পথ। সকালে পৈঠাতে বসে ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মাজছে খগেন। উপেনকে এত সকালে দেখে অবাক।

—এত সকালে কোথায় চললে হে উপেন?

রাধাকে দেখিয়ে উপেন বললো—কাল রাতে নোটনকে বোধহয় বিষহরি দংশেছে।

—তা সঙ্গে তোমার ওটি কে?

—নোটনের মেয়ে।

—এ্যাঁ নোটনের মেয়ে! সেই কুড়োনো মেয়েটা! বাঃ ছুঁড়িতো বেশ ডাগর হয়েছে। ডেঁসেছে। এবার খসবে।

খগেন হয়তো আরো দু'চার কথা শোনাতো। কিন্তু শোনার সময় কোথায়। মৃত্যু যে কড়া নাড়ছে নোটনের দরজায়।

দুপুরের পূর্বেই নোটনের শরীর নীল হয়ে গেল বিষে। থেমে গেল বুকের স্পন্দন। উপেনের সব কারিকুরি, সব বিদ্যা ব্যর্থ হলো। ব্যর্থ হলো মন্ত্রতন্ত্র। ঝাড়ফুঁক। ব্রহ্মজাল। মুখ কালো করে ফিরে গেল উপেন। পরিস্থিতির কাছে সে পরাজিত। লজ্জিত।

কালী সংবাদ পেল অনেক পরে। কাল গিয়েছিল শ্যাম গঞ্জের আড়তে। বর্ষার রাতে বাড়ি ফেরেনি। গ্রামে ফিরে নোটনের মৃত্যু সংবাদে হত-চকিত। ছুটে এলো।

দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে রাধা। দৃষ্টি পার্থিব জগতের বাইরে।

নোটন নেই এ কথা ভাবতে পারছে না কালী। পরশু দেখেছে একতারা নিয়ে গান গাইছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব এলোমেলো। এ কেমন করে হয়!

দাওয়ায় শায়িত নোটনের দেহ। এখুনি হয়তো বলবে। কালী এত পরে এলি? বোস। নতুন গান বেঁধেছি। তোকে শোনাবো।

কিন্তু মানুষের ভাবনার সাথে জীবনের হিসাব মেলে না। কল্পনার সাথে ভবিতব্য চলে না। নোটন গোঁসাই সত্যি চলে গেছে। আর গান বাঁধবে না। গান গাইবে না। একতারা হাতে বের হবে না মাধুকরীতে।

এক আকাশ বিস্ময় নিয়ে কালী দেখলো। নির্বাক, পাষাণ প্রতিমার মত বসে আছে রাধা। দৃষ্টি নীল আকাশের শেষ সীমায়। কালীর পরিচিত রাধা এ নয়। অন্য কেউ। অন্য কোন নারী।

কলার ভেলায় মনসা গাছের ডাল বেঁধে (এটাই আঞ্চলিক রীতি) নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হলো নোটন গোঁসাইকে। সঙ্গে দেওয়া হলো তার প্রিয় একতারা। আখড়ার প্রাঙ্গণের প্রিয় কদমের শাখা।

ভাটার স্রোতে ভেলা তরতরিয়ে ভেসে গেল সাগরের দিকে। সবাইকে ছেড়ে চলে গেল নোটন। প্রিয় দেশ। প্রিয় গ্রাম। প্রিয় আখড়া। প্রিয় মানুষজন। আর প্রাণাধিক প্রিয় রাধাকে। একটা জীবনের ইতি ঘটলো অপ্রত্যাশিতভাবে। সমাপ্ত হলো একটা অধ্যায়।

আজ আলো জ্বললো না আখড়ায়। কে জ্বালাবে। শোকে স্তব্ধ আখড়ার বাতাস। সন্ধ্যা আসছে। কালো অন্ধকার নামছে। প্রতিবেশীরা চলে গেছে। ফাঁকা আখড়ায় একা বসে আছে রাধা। তার জীবনের প্রথম অধ্যায় প্রায় সবটাই বিস্মরণের অন্তরালে। ছায়া ছায়া। কিছু

ভগ্নদৃশ্য স্মরণের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। কানু গোঁসাইয়ের আখড়ার কথা স্মরণে আছে। স্মরণ আছে বিক্ষুব্ধ এক রাতে তার হাত ধরে কানু গোঁসাই এনেছিল আখড়ায়। এর পূর্বের স্মৃতি বিস্মৃত। দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছিল নোটন গোঁসাইকে ঘিরে। একাধারে নোটন তার গুরু। পিতা। আশ্রয়দাতা। বিশাল ছায়া বিস্তার করে বুকের নিরাপদ স্থানে আগলে রেখেছিল। ঝড় ঝাপটা থেকে বাঁচিয়েছে। দুরন্ত পৃথিবীর আঁচ লাগতে দেয়নি।

আজ শুরু হলো তৃতীয় অধ্যায়। নতুন জীবন। যে জীবন তার অজানা। চেনে না। জানে না। আজ রাধা বড় একা। নিঃসঙ্গ। বিশাল পৃথিবীর জটিল পথে চলতে হবে সঙ্গীহীন। যে পথ সে চেনে না। দিশা-হীন এই পথ পরিক্রমায় নেই কোন পরিচিত মানুষের অভয় ডাক। এ পথ ভীষণ পিছল। ভীষণ বন্ধুর। বিপদসঙ্কুল।

বিকালে অনেক মানুষ এসেছিল সহমর্মিতা জানাতে। সান্ত্বনা দিতে। অযাচিত উপদেশও দিয়েছে কেউ কেউ। এখন আপন আবর্তে ফিরে গেছে পড়শিরা। একাকীত্বের কালো হাত ধীরে ধীরে বেষ্টন করেছে রাধার চারপাশ। বিষণ্ন সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকারে রাধা বসে আছে একা। অস্তিত্বের চারিদিকে অনুভব করছে একজন মানুষের নীরব উপস্থিতি। মমতামাখা হাতের স্পর্শ। তবুও বাতাসে পাখা বিস্তার করছে বিশাল শূন্যতা। অন্ধকারের বৃত্ত ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ। নিঃসঙ্গতার ধারালো দাঁতের হিসহিসানি কানে বাজছে।

শিথিল পায়ে রাধার সামনে এসে দাঁড়ালো কালী। এতক্ষণ যে তটিনী ক্ষীণস্রোতা ছিল হঠাৎ বাঁধ ভেঙে বন্যা এলো। অবলম্বনহীন অপরাজিতা লতার মত লুটিয়ে পড়লো কালীর পায়ের ওপর।

—আমি এখন কী করবো?

কালীর কানে সহস্র কণ্ঠে ডেকে উঠলো—কী করবো। কী করবো। সহায় সম্বলহীনা যুবতীর আকুল প্রশ্ন। ভালবাসার সামান্যতম অধিকার নিয়ে রাধা জানতে চাইলো। সত্যিতো এই আপৎকালে কে আছে আপন-

জন যার কাছে দাবি করতে পারে। যার কাছে আশ্রয় পেতে পারে। পেতে পারে বেঁচে থাকার ন্যূনতম আশ্বাস। কে বাড়িয়ে দেবে বরাভয়ের হাত। কালীই একমাত্র মানুষ যে তার হৃদয়ের প্রতিবেশী। যার ওপর ভরসা করতে পারে। নির্ভর করতে পারে। দাবি করতে পারে। করজোড়ে ভিক্ষাও চাইতে পারে।

দু'হাত বাড়িয়ে রাধার হাত ধরলো কালী। এ হাত বিশ্বাসের হাত। এ হাত নিশ্চিন্ত নির্ভরতার হাত। বরাভয়ের হাত।

ঝঞ্ঝা উত্তাল সাগরে মৃত্যু ভয়াল রাক্ষসীর হাঁ নিয়ে তেড়ে আসছে সময়। আপৎকালে অভয় বাণী উচ্চারিত হলো কালীর কণ্ঠে।

—আমি আছি রাধা। আমি আছি।

বাঁধভাঙা প্লাবনের মত রাধা আছড়ে পড়লো কালীর বুকে। শেষ অবলম্বন হিসাবে নির্ভরতায় আঁকড়ে ধরলো।

॥ ৯ ॥

জীবন সোজা পথে চলে না। সে চলার পথ বড় জটিল। পিছল এবং সর্পিল। কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কণ্টকাকীর্ণ। উত্থান পতনের রজ্জুতে বাঁধা অনিশ্চিত শ্রুতিলিখন। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাধা উপলব্ধি করছে ভাবাবেগের ওপর নির্ভর করে জীবন চলে না। জীবন চলমান এক বাস্তব চাহিদা। হাজার জীবন্ত চাহিদার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে জীবন নামের সর্পিল পথটা। উত্থান পতন আছে, আছে ঝড় ঝাপটা, খরা-বন্যা। জীবনের সার্বিক চাহিদা মেটে না ভাবাবেগে। আর যাইহোক উচ্ছ্বাসে জীবন চলে না। বোকা অথবা পাগলরাই ভাবাবেগ অথবা উচ্ছ্বাসের লাগামে ধরতে চায় জীবনকে।

নোটনের জীবিতাবস্থায় রাধা কালীকে নিয়ে অনেক নোংরা কাহিনী

পল্লবিত হতো গ্রামের আনাচে কানাচে। মুখরোচক সংবাদ হয়ে তা ঘুরে ফিরতো পথে ঘাটে। হাটে, বাজারে, স্নানের ঘাটে, জলের কলে। কর্মহীন জীবনের বিচিত্র বিলাস। জটিল এবং সূক্ষ্ম সুখানুভূতি সুড়সুড়ি দেয় শিরায় শিরায়। পল্লবিত হয় সে কাহিনী। হোক না কল্পিত। অথবা নিন্দুকের রটনা। হোক ঈর্ষাকাতর মানুষেব প্রতিশোধের শাণিত হাতিয়ার।

ঘি-আগুন একসাথে থাকলে না গলে থাকতে পারে? গ্রামের অনেক মানুষের বিশ্বাস বয়েসকালের ছেলে, সোমত্ত মেয়ে কিছু না ঘটে আছে? নিশ্চয় অন্ধকারের পিছল সম্পর্ক আছে রাধা-কালীর মধ্যে।

ঘি-আগুনের সম্পর্ক। মাঝে মাঝে গলে।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ার স্বপ্ন দেখে তারা।

এখন নোটনের অবর্তমানে নতুন নতুন কাহিনী পল্লবিত হচ্ছে প্রতিদিন। দুপুরের মহিলা মহলে। পুরুষদের সন্ধ্যার মজলিশে। রাধা কালী সংবাদ প্রধান আলোচ্য বিষয়।

এদের চিন্তার প্রসারতা এবং কল্পনাশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে এরা লিখনে পটু হলে আরো দু'একটা মহাকাব্য রচনা অসম্ভব হতো না।

সব কথাই কানে আসে রাধার। গায়ে মাখে না, পরিস্থিতি তাকে সহিষ্ণু করেছে। সমুদ্রে যে ডুবেছে শিশিরে তার কী ভয়। নিন্দা বা কলঙ্ক শরীরে স্থায়ী-চিহ্ন রেখে যাবে না। ওরা যত পারে বলুক। মনের সুখে বলুক। কিন্তু পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো মিটবে কেমন করে। অন্নবস্ত্র বাসস্থান, জীবনের প্রাথমিক চাহিদা। বাসস্থান একটা আছে। কিন্তু অন্ন বস্ত্র?

কালীর অভয়বাণী রাধার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। ছন্নছাড়া জীবন তার। পৈত্রিক দু'কাঠা জমির ওপর একটা কুঁড়ে ছাড়া সম্বল কিছু নেই। জীবিকা মৈনুদ্দিন মিঞার নৌকার মাঝি। মাছমারা। বাকি সময় গান বাঁধে। গান গায়। একবেলা খেয়ে তিন বেলা উপোস থাকে। সে

কেমন করে নেবে আর একটা জীবনের দায়িত্ব ?

অভিভাবকহীনা রাধাকে বেওয়ারিশ মালের মত গ্রামের কিছু দুষ্টু মানুষ ঠুকরে চেখে দেখতে চায়। লাম্পট্যের জিভ দিয়ে চেটে দেখতে চায় মেয়েটার যৌবন কতটা মোলায়েম। রাতের অন্ধকারে ঘরের চালে ঢিল পড়ে। উঠোনে কারা চলে বেড়ায়। ভৌতিক পদশব্দ গভীর রাতে দাপিয়ে বেড়ায় ঘরের আনাচে কানাচে। বন্ধ দরজায় টোকা পড়ে। ধারালো কাটারি হাতে রাধার রাত কাটে বিনিদ্র। প্রকাশ্যে, দিবালোকে অশ্লীল ইঙ্গিত আছড়ে পড়ে তার সামনে। বাঁকা ইশারা। 'রাখনি' প্রস্তাব দিয়েছে গোপনে দু'একজন।

এভাবে বাঁচা যায় না। কালী কেন যে বোঝে না। কোন যুবতীর এভাবে একা একা থাকা নিরাপদ নয়। হাজার বিপদের ভয়ঙ্কর হাত পেছনে তাড়া করে সর্বক্ষণ। কালীর অজানা নয় রাধা সব হারিয়ে প্রতীক্ষায় আছে। তারই ভরসায় দুরন্ত ঝঞ্ঝাতাড়িত সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসে আছে পাড়ি দেবার জন্যে।

কিন্তু লজ্জার কথা কেমন করে শোনাবে কালীকে।

—আমি যে আর পারছি না কালী।

কী পারছে না রাধা ? কিসের কষ্ট ? বড় ভাল মেয়ে। গোঁসাই মরে বড় কষ্টে ফেলেছে।

—কী অসুবিধা হচ্ছে রাধা ?

প্রথমে বিস্ময় ছিল কালীর। এবার রাধার পালা। সামান্য কথাটার বোঝার বোধ নেই কালীর, ওকি মানুষ। না অন্য কিছু! সামনে পড়ে থাকা অরক্ষিত বিশাল জীবনের দায়িত্ব নেবে কেমন করে। সত্যি কি এমন বোধ বুদ্ধিহীন। বোঝে না নারী কত অসহায় হলে তবে দৈন্যের কথা পুরুষকে শোনায়। এতটা বেহায়া হয়।

—তুমি এখনো চোখ বন্ধ করে থাকবে ? তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছো না ?

কালী নীরব। আসলে রাধার কথাগুলো হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। কালীর নীরবতায় মাথা কুটতে ইচ্ছা করছে রাধার। এই মানুষটার ভরসায় আজো বেঁচে আছে! মানুষটা অন্ধ — না বোধহীন।

— ওরা আমাকে খেয়ে ফেলবে।

কালীর হাতদু'টো জড়িয়ে ধরলো রাধা।

— কালী, আমাকে বাঁচাও।

লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে কোনরকমে রাধা বললো।

— আমার সামনে এখন দু'টো পথ। এক — মৃত্যু। দু'ই — বিয়ে করে আত্মরক্ষা। আমি বাঁচতে চাই কালী। তুমি আমাকে বিয়ে করো। আমাকে বাঁচাও, শত্রুর মুখে পোকা পড়ুক।

বিয়ে! এরকম কিছু কোনদিন ভেবেছে কি কালী? মনের অতলে অনুসন্ধান করে দেখলো রাধাকে নিয়ে এরকম ভাবনার সজীব অস্তিত্ব আছে কিনা। বুকের গহিনে ফুলশয্যা রচিত আছে কি রাধার জন্যে।

ফুলের মত পবিত্র রাধা কাঁদছে দু'হাতে মুখ ঢেকে।

কালী আপন বুকের গহনে আতিপাতি অনুসন্ধান করে দেখছে সেখানে অনেকটা স্থান রাধার নামে সংরক্ষিত। কৃষ্ণযাত্রায় শুনেছিল 'রাধা নামে সাধা বাঁশি'। কৃষ্ণের বাঁশি যখন বাজে রাধা নামেই বাজে। গহন গোপনে, আপন সত্তায় কালী দেখছে সব রাধা নামে ভরা। রাধাকে বাদ দিলে সব মিথ্যা। কালী অসম্পূর্ণ। অসমাপ্ত।

বোরুদ্যমানা রাধার মুখটা তুলে কালী বললো —

— দু'টো দিন অপেক্ষা করো।

— না, না আর একটা দিনও নিরাপদ নয়।

রাধা কাঁদছে, কালী হতবাক। আপন সত্তার গহিনে খুঁজছে হারানো একটা জিনিস। খুঁজছে। কালী খুঁজছে। হঠাৎ রাধার হাত ধরে নোটনের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভের সামনে গিয়ে বললো—

— পেন্নাম করো।

বিস্মিত হলেও বিনা বাক্যব্যয়ে প্রণাম করলো রাধা। কালীও করলো।

—প্রভু, আজ থেকে রাধা আমায় বউ। তুমি সাক্ষী থাকলে।

—ব্যস হয়ে গেল। প্রাণখোলা হাসি হেসে কালী বললো—আজ থেকে তুমি আমার বউ।

কালীর কাণ্ড কারখানা দেখে রাধা হতবাক। মানুষটা কি পাগল। যদিও কণ্ঠিবদল, মালাচন্দন তাদের সামাজে চুক্তিপত্র। রাধা এখন ভাবছে—আর যাই হোক কালী ভণ্ড নয়, প্রতারক নয়। এমন মানুষকে বিশ্বাস করতে মন চায়।

খুশি খুশি মন নিয়ে অনেকটা রাতে ফিরে গেল কালী। আর গভীর রাতে কয়েকটি পদশব্দ এসে থামলো রাধার বন্ধ দরজার সামনে। যা ছিল দূরে তা এলো নিকটে। রাধা কিছু বোঝার পূর্বেই বাঁশের ভঙ্গুর দরজা ভেঙে পড়লো যৌথ পদাঘাতে। কঠিন দু'টো হাত চেপে ধরলো তার মুখ। অন্য দু'টো হাত শরীরে লুকানো রত্নের সন্ধানে শুরু করলো প্রচণ্ড দাপাদাপি। উনিশ বছরের পেলব অনাঘ্রাত শরীরের ওপর শুরু হলো আদিম লালসার উন্মত্ত উল্লাস।

জ্ঞান ফিরলো অনেক পরে। কান্নায় ভেঙে পড়লো রাধা। সবহারানোর হাহাকার তার হৃদয়ের মরুভূমিতে ঝড় তুললো। মরু ঝড়। তছনছ হয়ে যাচ্ছে দৃশ্যমান জগৎ। নীল আকাশ। নীল পৃথিবী।

কালী তোমাকে আমি কি দেব! আমি শেষ হয়ে গেলাম। উনিশ বছর ধরে তিল তিল করে যা কিছু সঞ্চয় করেছিলাম সব লুঠ হয়ে গেল। ছিনতাই হয়ে গেল। আমি—আমি আজ রিক্ত। নিঃস্ব।

অব্যক্ত কান্নায় চুরচুর হয়ে যাচ্ছে রাধা। খানখান হয়ে ঝরে পড়ছে বর্তমান। ভবিষ্যৎ।

রাধা কাঁদছে। কালী ভাবছে। গতকাল সন্ধ্যায় তো প্রভুকে সাক্ষী রেখে কথা দিলাম। তবু কেন কাঁদে রাধা!

—রাধা। কী হয়েছে? কালই তো রাধামাধবের সামনে বলেছি—

—মিথ্যা। ঠাকুর ফাকুর সব মিথ্যা।

ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে দাঁড়ালো রাধা। পরক্ষণেই ঝিমিয়ে পড়লো শিকড় কাটা লতার মত। ফুলে ফুলে কাঁদলো অনেকক্ষণ। কালী ওকে কাঁদতে দিল। কাঁদুক। কেঁদে হাল্কা হোক মেয়েটা।

অনেক পরে প্রকৃতিস্থ হলো রাধা। গতকালের ঘটনাগুলো অকপটে স্বীকার করলো কালীর কাছে।

নীরব দু'জনেই। রাধা ভাবছে, কালীও ভাবছে। নীরবতার ব্যবধান দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে দিল দু'জনার কাছ থেকে। অনেক পরে নীরবতা ভাঙলো রাধা।

—এরপর আমার মরণ হওয়া উচিত।

কালী নির্বাক

কালীর নীরবতা কঠিন অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রাধাকে। দাওয়া থেকে উঠোনে নামলো।

—কোথায় যাচ্ছো রাধা?

রাধা থমকে দাঁড়ালো। দেখলো কালীকে। হঠাৎ পাগলের মত হাসলো।

—এরপর যাবার একটাই জায়গা আছে আমার।

—কোথায়?

—মা গঙ্গার কোলে।

—দাঁড়াও।

রাধার হাত ধরে ঘরের দাওয়ায় এনে বসালো কালী।

—আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না।

দু'ঘণ্টা পরে ফিরলো কালী। সঙ্গে শ্রীকান্ত, সরলা, কার্ত্তিক, হাবুল, নবীন, শৈল, বকুল, পদ্ম, জেলেপাড়ার অর্ধেক মানুষ। মৈনুদ্দিন এলো একটু পরে। কার্ত্তিক পুরুত ভবেশ ঠাকুরকে সাথে নিয়েই এসেছে। মৈনুদ্দিনের মেয়ে হামিদা নিয়ে এলো দু'টো বনফুলের মালা। উঠোনের তুলসীতলায় অনাড়ম্বর বিয়ে হলো রাধা আর কালীপদর। মেয়েরা শাঁখ

বাজালো। বরণ করলো। হাসি মস্করা করলো। বাতাসা দিয়ে মুখ মিষ্টি করলো। সবাই হাসলো। গাইলো, নাচলো, আনন্দ করলো। বেচা খটেলের চুল্লু খেয়ে মাতাল হলো কেউ কেউ।

॥ ১০ ॥

গদাখালি থেকে ফিরছে খগেন। মাথায় ছাতা, হাতে ফিতে ছেঁড়া হাওয়াই। ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ির কৌটোর চিরাচরিত শব্দ। আলের পথ ধরে ফিরছে বিষ্টুপুরে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। রোদের তাপে কানের মধ্যে ঝিল্লি ডাকছে, মাথায় ছাতা থাকা সত্ত্বেও নয়ানজুলির জলে গামছা ভিজিয়ে মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে। ইদানীং হঠাৎ হঠাৎ মাথা ঘোরে। অল্পেতেই মাথা গরম হয়। ডাক্তারের কড়া নির্দেশ মাথা গরম করা চলবে না। প্রেসার বেড়েছে।

বিষ্টুপুর গ্রামকে দু'ভাগ করে বাস রাস্তা চলে গেছে কোলকাতা পর্যন্ত। নতুন পীচ ঢালাই পথ। বছর খানেক বাস চলছে। তার পূর্বে পুরানো মডেলের ঢাউস ঢাউস ভাড়ার মোটর চলতো। এখন টাকা দিলেই বিষ্টুপুরের মানুষদের হুস্ করে কোলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে। সকালে গিয়ে বিকালে ফেরা যায়। সময়ের সাশ্রয়। দূরত্ব কমেছে কোলকাতার। দূরকে নিকট করেছে। সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়েছে সবকিছুর। আগে পথ কাঁচা ছিল। এখন পাকা হয়েছে, বাস চলছে। গ্রামের রূপ পরিবর্তন হচ্ছে দ্রুত। কিশোরী কন্যা যুবতী হচ্ছে, যৌবনের চিহ্ন স্পষ্ট হচ্ছে শরীরে। যৌবন আসছে। আধুনিক সভ্যতার হিল-হিলে কালো হাত আগিয়ে আসছে গ্রামের দিকে।

পূর্বে নদীপথে নৌকা আর স্থলপথে গোরুর গাড়ি ছাড়া বাহন ছিল না শহরে যাবার। নৌকা পথে কোলকাতা যেতে অনেক সময় ব্যয়

হতো। আর স্থলপথে গোরুর গাড়িতে শ্যামগঞ্জে গিয়ে বাস ধরতে হতো। নয়তো আরো কয়েক মাইল গিয়ে রেল।

লখিমপুরের দিকে একটা সিনেমাহল বসেছে। সন্ধ্যে বেলায় অনেকে সেজেগুজে সিনেমা দেখতে যায়। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। মুখে পাউডার মেখে, চুলে গন্ধতেল দিয়ে বাসে চড়ে সিনেমায় যায়।

বিষ্টুপুরের পাকা সড়কে ওঠার মুখে থমকে দাঁড়ালো খগেন। ইটের রাবিশ ছড়ানো একটা সরু পায়ে-চলা পথ সোজা চলে গেছে পূব দিকে। বিষ্টুপুরের পূব পাড়ায়। সামনের বাঁকটা পার হলেই ভূতনাথ রায়ের বাড়ি।

—শালা ভূতো।

অসাবধানে খগেনের মুখ থেকে ছিটকে গেল কথাটা। মহাপুরুষরা বলেন মনের কথা মুখ দিয়ে প্রকাশ হয়। মুখ দিয়ে যা বের হয় তা আগে মনের পাকশালায় গোপনে তৈরি হয়। খগেনের মনের জ্বালা বের হলো মুখ দিয়ে। যদিও সে মনে প্রাণে চেষ্টা করছে সভ্য মার্জিত হতে। মেয়ে কলেজে পড়ছে, ভদ্রমানুষদের সাথে ওঠা-বসা করছে। বাপের জন্যে মেয়ের সম্মানহানি হোক খগেন চায় না। তাছাড়া সমাজের কেষ্ট-বিষ্টু হতে গেলে সভ্য মার্জিত হতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষা না থাকলেও সে চেষ্টা করছে শিক্ষিত মানুষদের আচার, আচরণ ব্যবহার শিখতে।

কিন্তু ভূতনাথ রায়ের নাম মনে পড়লে ব্রহ্মতালু দাউ দাউ জ্বলে ওঠে। এই লোকটাই তার জীবনের শনি, চরম শত্রু।

খগেন বুদ্ধিমান, কিন্তু নিজের সম্পর্কে তার ধারণা আরো উঁচু। এটা আসলে তার অহমিকা। এ কথা একশোবার সত্যি খগেনের বুদ্ধির কাছে আজ পর্যন্ত কেউ এঁটে উঠতে পারেনি। এলাকায় সে অপরাজেয়। ছলে-বলে কৌশলে সবাইকে পরাজিত করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ভূতনাথ রায়। খগেনের সব বুদ্ধি, কৌশল ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে ভূতনাথের শাণিত বুদ্ধির কাছে। বার বার পরাজিত হয়েছে খগেন। অপমানিত হয়েছে। লাঞ্ছিত হয়েছে। ব্যর্থতায়, আক্রোশে ঈর্ষায় ভূতনাথের নাম মনে পড়লেই

মুখে খিস্তির ঢেউ ওঠে। বন্যা ছোটে।

খগেন উঠতি ধনী। তার অর্থ সম্পত্তি, প্রভাব এক প্রজন্ম পার হয়নি। ধনে মানে এখনো নাবালক। কিন্তু রায়েরা কয়েক প্রজন্মের বর্ধিষ্ণু ধনী। প্রভাব প্রতিপত্তি আকাশ-ছোঁয়া। রায়েদের পারিবারিক ঐতিহ্য আছে, যা অহংকারের। ভূতনাথ রায় তাই মাঝে মাঝে একান্ত কাছের মানুষদের বলে—

—পায়ের চটি মাথায় উঠতে চাইছে। এ্যাঁ, শালা জেলের-পো জাল না ফেলে মালিক হবে। ছোঃ ছোঃ ওল যতই নাচুক ডাঁটার নিচেই থাকতে হবে।

ভূতনাথের এ কথা বলার হক আছে। তার পূর্বপুরুষ এ এলাকার জমিদার। একশো বাইশটা গ্রাম ছিল জমিদারির অন্তর্গত। ধন সম্পত্তি কত তার হিসাব কেউ জানতো না। দেশের মানুষের কাছে ছিল 'রাজাবাবু'। তাদের চাল-চলন ছিল রাজার মতই। হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, অনেক লেঠেল ছিল। রায়বাড়ির দেউড়ি পাহারা দিত ভোজপুরী দারোয়ান। কিংবদন্তী—লক্ষ্মী বাঁধা ছিলেন রায়বাড়িতে। স্বাধীনতার আগে রায় পরিবারে সূর্য অস্ত যেত না। ব্রিটিশ সরকারের সাথে দহরম মহরম ছিল। ভূতনাথের পিতামহ কেদারনাথ রায় 'রায়বাহাদুর' উপাধি পেয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে। ভূতনাথের বড় পিসিমার বিয়েতে ছোটলাট এসেছিল রায়বাড়িতে। সাজানো বজরায় হাজারজন লাল-মুখো গোরা সাহেব নিয়ে বিষ্টুপুরের মাটিতে পা রেখেছিল। রায়বাড়ির দেউড়িতে শ্বেত পাথরের স্মৃতিফলকে আজো সে বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। সেদিনের কথা এখন অবশ্য গল্পের মত শোনায়।

সে যুগে রায়বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ হতো। কাঙালী ভোজন হতো তিনদিন। বাড়ির বড়কর্তা গলবস্ত্র হয়ে সবাইকে আপ্যায়ন করতো। ওই তিনদিন রাজা-প্রজা এক পংক্তিতে ভোজন করতো। মাসাধিক কাল ধরে ফুল দোলের উৎসব হতো। রাসের মেলা বসতো। কোলকাতার যাত্রাদল আসতো। টপ কীর্তন তরজা বাউল চলতো।

রাধাবল্লভের নামে একশো বিঘা শালি জমি দেবত্র ছিল। রায়েদের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ। বাড়ির পাশ দিয়ে গান গেয়ে পথ চললে ভোজপুরী দারোয়ান ধরে আনতো তাকে। বাবুর সামনে গান গাইতে হতো। গান শুনে বাবু খুশি হলে পুরস্কার মিলতো। না হলে মাথা মুড়িয়ে মুখে চুন-কালি মাখিয়ে গ্রামের বাইরে বের করে দেওয়া হতো। জুতো পায়ে রায়বাড়ির পাশ দিয়ে কারো হাঁটার অধিকার ছিল না। জমিদারের অনুমতি নিয়ে তবে প্রজারা পুত্র-কন্যা বিয়ে দিতে পারতো। জমিদারি এলাকার মধ্যে রায়বাড়ির থেকে উঁচু বাড়ি করলে রায়বাড়ির লেঠেলরা তা ভেঙে মাটির সমান করে দিয়ে আসতো।

বিষ্টুপুরের পূব পাড়ায় মোটা মোটা থামওয়ালা খিলান দেওয়া চকমিলানো চারমহল বাড়ি আজো সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে সে যুগের অহংকারকে বুকে নিয়ে। কিংবদন্তী—ওই বাড়ির কোথাও লুকিয়ে আছে সে যুগের কোষাগার। সাতরাজার ঐশ্বর্য লুকানো আছে সেখানে। কিন্তু রায়বাড়ির বর্তমান প্রজন্মের মানুষরা হদিশ জানে না সে ঐশ্বর্যের। চার-মহলের কোন মহলে মাটির নিচে ছিল অন্ধকূপ। কারাগার। অবাধ্য বিদ্রোহী প্রজাদের ধরে এনে কয়েদ করা হতো। আলো বাতাসহীন বন্ধ ঘরে তিল তিল করে জীবনের আলো নিভে যেত। কেউ জানতে পারতো না মানুষটার কি হলো, কোথায় গেল।

বিশাল বাড়ির কিছু অংশে রায়েদের বর্তমান প্রজন্মের কেউ কেউ বাস করছে। কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে কালের খতিয়ান থেকে। বাড়ির সামনের বিশাল শিবমন্দিরের মূল অংশটা এখনো অটুট আছে। নাট মন্দির ধ্বংস হয়েছে, কাছারি ভেঙে গ্রামের পথে বিছানো হয়েছে। পাড় বাঁধানো বিশাল দীঘি আজো আছে। কথিত আছে বাড়ির কোন এক ছোটবউ স্বামীর কাছে মন্তব্য করেছিল বড় দীঘি নাহলে মানায় না। সেই ছোটবউ যতটা হেঁটে যেতে পেরেছিল ততবড় দীঘি খনন করা হয়েছিল। দীঘির নাম আজো ছোট বউয়ের দীঘি।

জলসা ঘরটা আজো ভগ্ন অবস্থায় টিকে আছে। বিরাট বিরাট ঝাড়-

বাত্তির কয়েকটা এখনো ঝুলছে ছাদের আঙটা থেকে। ওই জলসাঘরে তৎকালীন দামি-নামি বাঈজী আসতো কোলকাতা থেকে। বিশেষ বিশেষ পরবে লক্ষ্ণৌ, বেনারস থেকেও আসতো।

সেকালে দেব দ্বিজে ভক্তি ছিল রায়েদের। পূব পাড়ায় জমিদারি এলাকায় অনেক মন্দির এবং মন্দিরের অংশ আজো টিকে আছে সে যুগের স্মৃতি নিয়ে। আজো দেশের মানুষের কাছে 'রায়েরা' বাবু।

রায় পরিবারে সূর্য অস্ত যেতে শুরু করে ইংরাজ রাজত্বের শেষ দিকে। তা সম্পূর্ণ হয় স্বাধীনতার পর জমিদারি উচ্ছেদের ধাক্কায়। তবে এখনো ফেলে ছড়িয়ে যা আছে তা দিয়ে অনেক খগেনকে কেনা যায়। ভূতনাথের দু'টো ভাই বিলেতে থাকে। একভাই ডাক্তার, অন্য ভাই ইঞ্জিনীয়ার। সেখানেই স্থায়ী বাস। সে দেশের নাগরিক। কোলকাতায় থাকে এক ভাই। আইনজীবী। গাড়ি-বাড়ি করেছে। বর্তমান বিধান সভার সদস্য এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী।

রায় পরিবারের শাখা প্রশাখা অনেক। গ্রামে আছে কিছু কিছু। কোলকাতাতেও আছে অনেক। শাখা প্রশাখা বর্তমানে কেউ সবল, কেউ দুর্বল। একটা শাখার এক সভ্য ভূতনাথ। গ্রামে পড়ে আছে যখের ধন আগলে। ভগ্ন প্রাসাদ পাহারা দিতে। মাঝে মাঝে তাই বলে—

—আমি অকাল কুষ্মাণ্ড। সবাই কিছু করলো আমি শুধু বিল সেঁচে মরলুম।

ভূতনাথের কথাটা অনেকাংশে সত্য। ছোটবেলায় বদদোষ এবং বদ সংসর্গে পড়ে অনেক কিছু খুইয়েছে। বেশি লেখাপড়া শেখেনি। তাই বলে একেবারে মূর্খ নয়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বাড়াতে হয় না দস্তখত করার সময়। স্কুলের গণ্ডি টপকে কোলকাতার কলেজে ভর্তি হয়েছিল। থাকতো হস্টেলে। সেই সময় কোলকাতার বিখ্যাত বাঈজী সুরাইয়া এসেছিল বিষ্টুপুরের রায়বাড়িতে। বিরাট নাম। কোলকাতায় ফিরে ভূতনাথ যোগাযোগ করেছিল সুরাইয়ার সাথে। সুরাইয়ার যৌবনের সাগরে অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েছে সে সময়। তারপর হঠাৎ পিতৃবিয়োগের কারণে সব

ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছিল। আর ফিরে যেতে পারেনি কোলকাতায়। বিষয় সম্পত্তির জালে জড়িয়ে পড়েছে ক্রমশ।

ভূতনাথ গ্রামের বাড়িতে থাকলেও পরিবারের অন্য শাখা শরিকদের মত বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে খায় না। সে ব্যবসা করে। বিষ্টুপুর এবং সুন্দরবন এলাকায় তিনটে চালকল আছে। এছাড়া চালানি ব্যবসাও আছে। নারকেল সুপারি ঝাঁটাকাঠির আড়ত আছে হাকিমগঞ্জে। সুদূর সুন্দরবন নামখানা কাকদ্বীপ। মেদিনীপুরের কাঁথি দাঁতন হলদিয়া নূরপুর থেকে নৌকা ভর্তি হয়ে মাল এসে জমে ভূতনাথের আড়তে। সেই মাল পুনরায় ট্রাক বা নৌকা বাহিত হয়ে চলে যায় কোলকাতায়। বড় বাজারে, মাড়োয়ারীর আড়তে।

লক্ষ টাকা ব্যবসা।

হাজার হাজার টাকার দৈনিক লেনদেন।

উঠতি ধনী খগেন সহ্য করতে পারে না ভূতনাথ রায়কে। ঈর্ষায় জ্বলে, প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। বিপরীতভাবে বনেদী ধনী ভূতনাথ উঠতি ধনী খগেনের উচ্চাশা ভাল চোখে দেখে না। দু'জনের বিরোধ এখানেই।

খগেন চাইছে বড় থেকে আরো বড় হতে। রায়েদের সমকক্ষ হতে। আর ভূতনাথ ভাবছে কোথাকার কে জেলের ব্যাটার এত উচ্চাশা কেন? মাছ ধরে খাচ্ছিস খা, আমার দিকে হাত বাড়াচ্ছিস কেন!

সংঘাতটা স্বার্থের।

খগেন ভূতনাথের মত অর্থ যশ প্রতিপত্তি পেতে চাইছে। রায়েদের যা কয়েক প্রজন্মের লব্ধ অহংকার, এক প্রজন্মে তাই পেতে চাইছে খগেন। একজন আকাশ ছুঁতে চাইছে। অন্যজন তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে নারাজ।

ভূতনাথের সাথে অনেকগুলো মামলা চলছে খগেনের। অনেকরকম মামলা। একটা উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। খগেন যেমন মামলাবাজ, ভূতনাথও কম যায় না। বরঞ্চ এককদম আগিয়ে। মামলায় পারদর্শী না

হলে এযুগে বিষয় সম্পত্তি ব্যবসা রাখা যায় না। নানান ঝুট ঝামেলায় ফাঁসতে হয়। মামলাবাজের বংশধর সে। জমিদারি নিয়ে খোদ সরকারের সাথে অনেকগুলো মামলা লড়েছে। বর্তমানে — ব্যবসাসংক্রান্ত, চালকলের লাইসেন্স এবং অপারেশন বর্গা নিয়ে সরকারের সাথে অনেকগুলো মামলা লড়ছে ভূতনাথ। কয়েকটা নিজের অনুকূলে ডিক্রিও পেয়েছে।

উভয়েই বুদ্ধিমান, চতুর। পেশীর জোরে না গিয়ে টাকার জোরে আদালতে গেছে। যা হয় রাজদরবারে হবে। কয়েকটা মামলা চলছে অনেকদিন থেকে। নিম্ন আদালতের রায় পছন্দ না হওয়ায় উচ্চ আদালত পর্যন্ত গেছে। কেউ পরাজিত হতে রাজি নয়। যে যার এলাকায় শক্ত পায়ে দাঁড়াতে চায়।

ভূতনাথ রায়ের চালকলের পাশে থমকে দাঁড়ালো খগেন। বড় রাস্তার পাশেই চালকল। উঁচু চিমনি দিয়ে গল গল করে কালো ধোঁয়া উঠছে। বিশাল সিমেন্টের চত্বরে কামিনরা রোদে ধান মেলে দিচ্ছে।

— শালা ভূতো, বেজন্মার বাচ্ছা।

পুনরায় প্রতিপক্ষ ভূতনাথের উদ্দেশে গালাগাল নিক্ষেপ করে বড় রাস্তা থেকে আলের পথে নামলো খগেন।

এটাই সহজ পথ।

লখিমপুর যাওয়ার চৌরাস্তায় এসে দাঁড়ালো। চারদিকে চারটে পথ চলে গেছে। একটা বাসরাস্তা থেকে বিষ্টুপুরকে দ্বিখণ্ডিত করে চলে গেছে বিরলাপুর পর্যন্ত। সেখান থেকে এঁকেবেঁকে সর্পিল ভঙ্গিতে চলে গেছে আরো উত্তরে।

বিরলাপুর অধুনা শিল্পাঞ্চল হলেও আদি নাম শ্যামগঞ্জ। রায়েদের গৃহদেবতার শ্যামসুন্দরের নামে দেবত্র ছিল এলাকাটা। পরে বিরলা গোষ্ঠীর শিল্প প্রতিষ্ঠার সুবাদে শুরু হয়েছে নগরায়ণ। শ্যামগঞ্জ, শিল্প-নগরী বিরলাপুর নামে পরিচিত হয়েছে।

চৌরাস্তায় পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। আগে মেঠো আলের পথ

ছিল বাবলাগাছের ছায়ায় ছায়ায়। বর্ষায় সাপ উঠে আসতো দিনের বেলাতেই। পথ ছিল নির্জন। সমস্ত দিনে হাতে গোনা কয়েকটি মানুষের পা পড়তো এই পথে। একমাত্র চাষের সময় চাষিরা আসতো। জলপানির বেলা হলে বাবলা গাছের ছায়ায় বসে মুড়ি জল খেতো।

এখন পথ প্রশস্ত হয়েছে। মোড়ের মাথায় মুদি দোকান দিয়েছে প্রফুল্ল মোড়ল। গোটা দুই চা দোকান হয়েছে ইদানীং। হাটুরে মানুষরা পথ চলতে ক্ষণেক বিশ্রাম করে। চা খায়। এছাড়া একটা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ে উঠেছে গ্রামের মানুষের স্বার্থহীন সাহায্য এবং সহযোগিতায়। কালে কালে স্থানটার মাহাত্ম্য বাড়বে। জমে উঠবে শাখা প্রশাখায়। তখন গুরুত্ব বাড়বে। মূল্যও বাড়বে। ধানক্ষেতের বুক চিরে চার দিকে চারটে পথ চলে গেছে। ভবিষ্যতে পাকা রাস্তা হলে সোনার এলাকা হবে।

·

এখন অগ্রহায়ণ মাস, ফলন্ত ধানে সোনালি রঙ ধরেছে। রাসবিহারী ডাক্তারের দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশে চারদিকে আলবাঁধা একবন্দে পনেরো বিঘা জমি। পুরুষ্ট ধানের ভারে গাছগুলো অবনত মস্তকে সালাম জানাচ্ছে পথিক মানুষদের। খগেন দাঁড়ালো আলের পাশে। চোখে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে নিরীক্ষণ করলো। বিচিত্র শব্দ করলো জিভ দিয়ে। যা কিনা হতাশাগ্রস্ত মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়।

ওই পনেরো বিঘা জমি নিয়ে খগেনের সাথে ভূতনাথের মামলা চলছে কয়েক বছর। ভূতনাথের দাবি জমির মালিক সে, খগেনের দাবি সে কিনেছে অতএব ও জমি তার। সঠিক মালিক কে সে বিচারের ভার নিয়েছে আদালত। কালো কোটের বিশাল পকেটে, টাকা ভরে দিয়ে অপেক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আসলে জমিটার পশ্চাতে কৌতূহলী ইতিহাস আছে।

জমিটার মালিক কাঙ্কি বুড়ি। যৌবনে ওই মহিলা ছিল ভূতনাথের পিতা

ধনপতি রায়ের রক্ষিতা। উদরান্নের জন্য ওই জমি ধনপতি রায় রক্ষিতা কাঞ্চিকে ভোগ দখলের অধিকার দিয়েছিল মৌখিক। কাগজপত্র ছিল না।

খগেনের লোভ পড়লো জমিটার প্রতি। বড় রাস্তার ধারে, একবন্দে পনেরো বিঘা। খগেনের বহুদিনের পরিকল্পনা ভূতো রায়ের মত চালকল বসাবে এই বিষ্টুপুরে। জায়গাটা চালকলের উপযুক্ত। পাকা সড়কের লাগোয়া। অদূরে প্রবহমানা ভাগীরথী।

ধনপতি রায়ের মৃত্যুর পরেও দাবি ওঠে না রায়েদের পক্ষ থেকে। কাঞ্চি বুড়ি যেমন ভোগ দখল করছিল তেমনি চলতে থাকলো। সেই সুযোগটা নিল খগেন। বুড়িকে বুঝিয়ে, প্রলোভন দিয়ে, কয়েকশো টাকা নগদ দিয়ে সেটেলমেণ্টের সময় বুড়ির নামে স্থায়ী রেকর্ড করিয়ে দিল, ভূতনাথের অজ্ঞাতেই। তারপর পর্চা থেকে বিক্রি দলিল করে নিল নিজের নামে। বুড়ির হাতে দিল নগদ পনেরো হাজার টাকা। একসাথে অনেক টাকা পেয়ে বুড়ি খুশি হলো। পাছে কৌশল কেঁচে যায় তাই বুড়ি যতদিন জীবিত ছিল ততদিন জমিটা দখলের ঝামেলায় না গিয়ে নীরব ছিল খগেন। ভূতনাথেরও গোচরে আসেনি। বুড়ির মৃত্যুর পর খগেন দখল নিতে গেলে বাধলো ঝামেলা। জানাজানি হলো। হক কেউ ছাড়তে রাজি হলো না। উভয় পক্ষের কিছু মানুষ লাঠি বল্লম নিয়ে দাঁড়ালো সামনা-সামনি। সংঘর্ষ হয়েছিল, আহত হয়েছিল তুই পক্ষের কয়েকজন। শেষ পর্যন্ত কয়েকটা ফৌজদারি। বর্তমানে মালিকানা নিয়ে মামলা চলছে।

জমি কিন্তু এখন ভূতনাথের দখলে। ভাড়াকরা লোক নিয়ে পেরে ওঠেনি খগেন। গ্রামের মানুষও সাহায্য করেনি। ভূতনাথের অর্থবল লোকবল অনেক বেশি। গায়ের জোরে সে দখল বজায় রেখেছে। খগেন চেষ্টা করেছিল ইন্‌জাংশান বহাল করতে। সেখানেও সুবিধা করতে পারেনি। মুরুব্বির জোর ভূতনাথের অনেক বেশি। ক্ষমতা, অভিজ্ঞতাও বেশি।

দখল যখন ভূতনাথের চাষ করে সে। খগেন মামলার ফল সম্পর্কে

সন্দিহান। তবুও জেদ বজায় রাখতে লড়ে যাচ্ছে। প্রতিজ্ঞা করেছে আজীবন লড়বে।

নদীর পাড় ছুঁয়ে জমির আল। জোয়ারের জল ওঠে, পলি পড়ে। আর পাঁচটা সাধারণ জমির থেকে উর্বর, ধান ভাল হয়। খরিফ বা রবি ফসলও ভাল হয়।

এখন ধানে পাক ধরেছে।

ধানের শীষে সোনালি চুমকি।

মনে মনে হিসাব কষলো খগেন। বিঘা প্রতি দশ মন ধান হলে এক-কথায় একশো পঞ্চাশ মন ধান। বেওয়ারিশ জলাশয়ে বড় মাছ জাল কেটে পালিয়ে গেলে শিকারীর মনের অবস্থা যেমন হয়। ধানক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে খগেনের মনের অবস্থা সেরকম।

—এ ধান আমার। ভূতো শালা জোর করে দখল নিচ্ছে।

ফলন্ত ধানের কয়েকটা শীষ ছিঁড়ে গুনে দেখে চুকচুক শব্দ করলো জিভে। হাতের মাছ ফসকে যেন অন্যের জালে চলে যাচ্ছে। বিজাতীয় ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলো। রায়বংশের ঊর্ধ্বতন চোদ্দপুরুষকে নিজের ভাষায় গালাগাল দিয়ে গায়ের জ্বালা মেটালো। পথের ধুলোয় থুথু ফেলে গোড়ালি দিয়ে পিষে অভিশাপ দিল—মর মর। নিব্বংশ-হ।

নিজের মনকে প্রশ্ন করলো—আমি কি অন্যায় করেছি? নিজেই উত্তর দিল।

—আমি কোন অন্যায় করিনি। নগদ টাকা দিয়ে আমার কেনা জমি। আমার হক পুরোপুরি, ভূতো শালা জবরদখল করছে।

পুনরায় আর একপ্রস্থ গালাগাল ছুঁড়ে দিল।

—আচ্ছা শালা। আমার নাম খগেন, তোমার বাপের বে দেখিয়ে ছাড়বো। ধরি যাকে ছাড়িনি।

আরো একঝলক কাঁচা খিস্তি উগরে বাড়ির পথে হাঁটা দিল খগেন।

বিষ্টুপুরের শান্ত বাতাস অশান্ত হলো। উত্তপ্ত হলো। কে বা কারা খগেন আর ভূতোর মামলা চলা বিতর্কিত জমির সমস্ত ধান রাতের অন্ধকারে কেটে নিয়ে পালালো।

গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হলো, পুনরায় আর একটা মারামারি, দাঙ্গা বুঝি ঘটতে চলেছে। গ্রামে পুলিশ আসবে, রাতের বাতাস চমকাবে পুলিশের বুটের মিছিলে।

সকালেই সংবাদ গেল ভূতনাথের কানে। গ্রামেরই কেউ আড়তে গিয়ে সংবাদ দিয়েছে। সরাসরি আড়ত থেকে ঘটনাস্থলে চলে এলো ভূতনাথ। নরম মাটিতে পায়ের ছাপ লক্ষ্য করলো গোয়েন্দাদের মত। কিছু ভাবলো, তারপর সপারিষদ চলে গেল আড়তে।

গ্রামের বাতাস থমথমে। কেউ কেউ কৌতূহলীও। নতুন পালা দেখার সম্ভাবনায়।

থানার বড়বাবু শ্যামলাল সরকার হঠাৎ ভূতনাথ রায়কে থানায় আসতে দেখে অবাক হলেন। সচরাচর 'রাজাবাবু' থানায় আসে না। যখনই আসে তখনই বোঝা যায় একটা কিছু ঘটেছে। অবশ্য এ কথা সত্যি। থানায় মানুষ বিনাকারণে বেড়াতে যায় না। অঘটন ঘটলেই যায়।

ভূতনাথ রায়ের পৃথক প্রভাব আছে। ব্যক্তিত্বও আছে। জমিদারের বংশধর বটেই। গ্রামের মানুষের 'বাবু', 'রাজাবাবু'। এখনো প্রবীণরা দেখলে করজোড়ে নমস্কার জানায়। স্বাভাবিকভাবে থানা পুলিশও সমীহ করে চলে।

—আসুন আসুন রায়বাবু। আমার কি ভাগ্য। বসুন। সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন থানার বড়বাবু। সামনের চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন।

ভূতনাথের শরীর দেখে বয়স বোঝা যায় না। শক্ত পোক্ত শরীর, উচ্চতায় ছ'ফুটের বেশি। প্রশস্ত ছাতি। মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল। সযত্নে ছাঁটা গোঁফ। রঙ ধবধবে ফর্সা। পরনে শান্তিপুরী মিহি ধুতি।

গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি। গলায় সরু সোনার চেন, একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। হাতের দশটা আঙুলের আটটাতেই দামি রত্নের আঙটি। জমিদারি রক্ত যে তার শিরায় বহমান ঠাট-বাটেই তা প্রমাণ করে।

বড়বাবুর সহাস্য আন্তরিক অভ্যর্থনাকে গুরুত্ব না দিয়ে সামনের চেয়ারে বসলো ভূতনাথ। গন্ধ দেওয়া রুমালে মুখ মুছলো।

—বলুন হঠাৎ কী মনে করে? সংবাদ পাঠালে আমিই যেতাম। ছ'চোখে চাঁচাছোলা দৃষ্টিতে শ্যামলাল সরকারকে দেখলো ভূতনাথ। জলদগম্ভীর স্বরে বললো—

—যেতে হবে না, এখানেই প্রয়োজন।

থানাদার শ্যামলাল সরকার অস্বস্তি বোধ করছে ভূতনাথের শীতল দৃষ্টির সামনে। সাপের দৃষ্টির মত হিলহিলে স্বচ্ছ ওই চোখের গভীরে লুকানো আছে অনেক কথা। অনেক ইঙ্গিত। অনেক প্রতিহিংসা।

—জনসাধারণের অর্থে আপনার মত শ্বেতহস্তী পালনের প্রয়োজন আছে কি?

খানিক শীতল দৃষ্টির লেসার নিক্ষেপ করে পুনরায় বললো—

—জনসাধারণের জান মান সম্পত্তির নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার হাতে। কতটুকু পালন করছেন সে দায়িত্ব?

কৈফিয়ৎ নেওয়ার ঢঙে কথাগুলো সরাসরি ছুড়ে দিল শ্যামলাল সরকারের মুখের ওপর।

ভূতনাথ রায়ের ক্ষমতার নাগাল অজানা নয় থানাদারের। এম. এল. এ., এম. পি. ভূতনাথের পকেটের লোক। অনেক মন্ত্রীর সাথে দহরম মহরম। বন্ধুত্ব। শুধু তাই নয় ভূতনাথের এক ভাই প্রভাবশালী মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর পেয়ারের লোক। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শ্যামলাল দারোগা।

—আমি বুঝতে পারছি না রায়মশাই। এমন কী ঘটলো যে আপনাকে থানায় আসতে হলো!

—বুঝতে পারছেন না?

—না বললে বুঝবো কেমন করে?

দারোগার চোখে চোখ রাখলো ভূতনাথ। মৃত সাপের মত শীতল দৃষ্টি।

—খগেন এত বাড়লো কী করে ?

অবাক হবার ভান করলো শ্যামলাল।

—খগেন ? মানে খগেন জানা ?

—এ অঞ্চলে অন্য কেউ খগেন আছি নাকি ?

উল্টে প্রশ্ন রাখলো ভূতনাথ।

—না—মানে, অন্য খগেন কেউ আছে কি···।

—হ্যাঁ ওই খগেন। জেলের ব্যাটা।

—খগেনবাবু আবার কী করলেন ?

—খগেনবাবু ! বিস্মিত ভূতনাথ। ফুঃ ফুঃ ও শালা জেলের ব্যাটা বাবু হলো কবে থেকে ? এ্যাঁ, পৌদির ব্যাটা পদ্মলোচন যে। একরাশ শ্লেষ উগরে দিল ভূতনাথ।

—বুড়ির খোপে আমার পনেরো বিঘা জমির ধান কেটে নিয়ে পালিয়েছে।

—খগেনবাবু নিয়ে পালিয়েছেন ! শ্যামলাল বিস্মিত।

—হ্যাঁ। খগেন চুরি করেছে। জোরের সাথে বললো—ভূতনাথ।

শ্যামলালকে ইতস্তত করতে দেখে স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় বললো—

—ওর বাড়ি তল্লাশী করুন। বামাল পেয়ে যাবেন।

—কিন্তু বিনা ওয়ারেণ্টে তল্লাশী······

—আইন জানি। ওয়ারেণ্ট ইস্যু করুন। একটু নীরবতা। শীতল দৃষ্টির পালিশ।

—আপনি না পারলে আমি অন্য ব্যবস্থা করবো।

শ্যামলাল দারোগা কিছু বলার পূর্বেই তার টেবিল থেকে রিসিভার তুলে রিং করলো ভূতনাথ।

—হ্যাঁ। আমি ভূতো বলছি। কে ? পরীক্ষিৎ ? তোমাকে এলাকার

মানুষ ভোট দিয়ে এম. এল. এ. করেছে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুতে? এ্যাঁ, হ্যাঁ আমি থানা থেকে বলছি। তোমরা কাকে নৌকায় তুলেছো হে···আমার সামনে তোমাদের ও. সি. নামের জীবটি বসে আছে। এ দেখছি ধেড়ে ছুঁচো। অভিযোগ কানে তুলছে না। আমার পনেরো বিঘা জমির ধান চুরি হয়েছে। নাম বলা সত্ত্বেও প্যাঁচার মত মুখ করে বসে আছে। মনে হচ্ছে ঘুষ-টুষ খায়।

ফোনের কথোপকথন শুনে মুখে রক্ত উঠলো শ্যামলালের। করারও কিছু নেই। ভূতনাথ রায় প্রভাবশালী এবং প্রতাপশালীও।

—হ্যাঁ আমি এস. পি.'র সাথে যোগাযোগ করতে চাইছি। এ্যাঁ করবো না? ও. সি.-কে দেবো? ও আচ্ছা ঠিক আছে। রিসিভার শ্যামলাল দারোগার হাতে ধরিয়ে দিল ভূতনাথ।

একেই বলে যে-রোগের যে-চিকিৎসা লক্ষণ বুঝে প্রয়োগ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয়।

ফোনে মিনিট খানেক কথা বলেই দারোগা বললেন—

—ঠিক আছে রায়মশাই আমি আজই তল্লাশীতে যাচ্ছি। বাধ্য ছেলের মত কথাগুলো বললো।

শ্যামলাল দারোগা দলবল সহ তল্লাশীতে এলেন। তছনছ করলেন খগেন জানার বাড়ি। উঠোন। খামার। ফেরার সময় খগেন নিয়মের ব্যতিক্রম করলো না। কুড়িটা ঝুনো নারকেল তুলে দিল জিপের কেরিয়ারে। বিনয়ের সাথে বললো—

—আপনারা না থাকলে আমি থাকি কী করে? আপনাদের হাতেই তো আমাদের জানমান।

যথা সময় ভূতনাথ রায়ের সংবাদদাতা জানালো খগেনের বাড়ি তল্লাশী করে চুরির বামাল পাওয়া যায়নি। ধান তো নয়ই। খড়ও নয়। তবে এককুড়ি ঝুনো নারকেল দিয়েছে দারোগাকে।

খাতায় দৃষ্টি রেখে, মুখ না তুলেই ভূতনাথ শুধু একটা শব্দ করলো:

—হুম।

ধানচুরিতে গ্রামের বাতাসে যে উত্তাপ উঠেছিল তা থিতিয়ে এলো। দু'সপ্তাহের মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা পূর্বের মত স্বাভাবিক। পড়শিরা যে খেলা দেখবে ভেবেছিল তা জমলো না।

হঠাৎ এক শন্‌শনে গভীর রাতে।

জনা পঞ্চাশ মানুষ লাঠি বল্লম বন্দুক নিয়ে খগেন জানার বাড়ি ঘেরাও করলো নিঃশব্দে। প্রত্যেকের নাক চোখ ছাড়া গামছার ফেটি মেরে বাঁধা। পড়শিরা টের পাবার পূর্বেই বড় কাঠের গুঁড়ির আঘাতে খগেনের বাড়ির সদর দরজা ভেঙে পড়লো হুড়মুড়িয়ে। নিশাচর আগন্তুকরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বাড়ির বাইরে পাহারায় থাকলো এক ভাগ। অন্য ভাগ প্রবেশ করলো বাড়ির মধ্যে। প্রত্যেকের হাতে তিন সেলের টর্চ।

বার বাড়িতে অপরিচিত শব্দে সন্দেহ হলো খগেনের, তার শিয়ালে-কান চমকালো। কিছু একটা ঘটছে বার বাড়িতে। মধ্যরাতের বাতাসে কাদের যেন ফিসফিসানি, ব্যস্ত চলা ফেরা।

নিদ্রিত স্ত্রীকে জাগিয়ে টেনে তুললো ছাদে। সিঁড়ির কোলাপসিবল গেট বন্ধ করলো মজবুত তালায়। চিলে কোঠা পুরানো জিনিসের ভাগাড়। ভাঙা খাট, ছেঁড়া জাল, ভাঙা হাল, বাতিল কাঁথা-কানি। পুরানো ভাঙাচোরা আসবাবের গুদামে স্ত্রীকে ঠেলে দিয়ে নিজেও গুঁড়ি মেরে ঢুকলো তার মধ্যে। চাচা আপন পরান বাঁচারে। বাইরে যা হয় হোক। পৃথিবী রসাতলে যাক, জায়গাটা নিরাপদ। সহজে এখানে কেউ আসবে না, আসতে পারবে না। এখানে কেউ লুকোতে পারে ডাকাতদের মাথায় সে বুদ্ধি আসবে না।

শ্রীমতী আতঙ্কিত। মধ্যরাতে মানুষটা এমন করছে কেন? ভয়ার্ত স্বরে বললো—বাইরে কী হচ্ছে গো?

—তোর বাপের ছাদ্দ হচ্ছে, চুপ কর।

দু'হাতে স্ত্রীর মুখ চেপে ধরলো খগেন।

ডাকাতরা সমস্ত বাড়ি চষেও খগেনকে পেল না। পেলে কি হতো বলা মুস্কিল। খগেনকে না পেয়ে প্রতিটা ঘরের আসবাবপত্র ভেঙে

তছনছ করে দিল প্রচণ্ড আক্রোশে। বাড়ির কাজের লোকটা আগেই পালিয়েছিল। কিন্তু মাহিন্দার উমেশ মোড়ল লাঠি হাতে মনিবের সম্পদ রক্ষার চেষ্টা করেছিল। ফলে ডাকাতদের লাঠির আঘাতে মাথা ফাটলো উমেশের। রক্ত ঝরলো অনেক। মনিবের নুনের মূল্য দিল নোনা রক্তের বিনিময়ে।

হল্লা শুনে গ্রামের কিছু সাহসী মানুষ ডাকাতদের প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল কিন্তু মুহুর্মুহু বোমার কান ফাটানো শব্দ আর চোখ জ্বালানো ধোঁয়ায় আগাতে পারেনি। ডাকাবুকো বলরাম বোমার ঘা খেয়ে ভীষণ ভাবে জখম হয়েছে।

ডাকাতরা চলে গেলে গ্রামের মানুষ দেখলো খগেনের বার বাড়ির চারটে ধানের গোলা এবং দু'টো খড়ের গাদা দাউ দাউ করে জ্বলছে। নগদ বা গয়না কিছু নেয়নি ডাকাতরা। শুধু ধ্বংস করে গেছে। প্রচণ্ড ঘৃণায় এবং আক্রোশে তছনছ করেছে সব। খগেনের আকাশছোঁয়া অহংকার থেঁতো করে দিয়েছে।

মা লক্ষ্মীকে পুড়তে দেখে পড়শিরা স্থির থাকে কেমন করে। মা তো শুধু খগেনের নয়। মা সবার। অনাদর, অপমান হলে তিনি রুষ্ট হবেন। আকাল লাগবে। খরা হবে। বন্যা হবে। মড়ক লাগবে দেশে। দুর্ভিক্ষ আসবে। যে যা হাতের কাছে পেল—বালতি কলসী এনে ধান খড় বাঁচাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু যেখানে পরিকল্পিত ভাবে কেরোসিন দিয়ে আগুন লাগানো হয়েছে সেখানে বালতি কলসী নেহাত বালখিল্য প্রচেষ্টা।

শুকনো খড় দাউ দাউ জ্বলছে। আয়ত্তের বাইরে। খগেনের উচ্চাশা পুড়ছে। পুড়ছে তার লোভ লালসা অহমিকা।

সকালেও খগেনের বার বাড়ির উঠোনে ছাইয়ের স্তূপ থেকে ধিকি ধিকি ধোঁয়া উঠছে, পোড়া খড়ের কটু গন্ধে বাতাস ভারী।

বৈঠকখানার পৈঠাতে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে খগেন, মাঝে মাঝে আক্ষেপ করছে—

—ভূতো শালা আমার সব্বনাশ করলে।

থানায় গেল খগেন। শ্যামলাল দারোগা তখন কোথাও বেরুচ্ছেন। ধরা-চূড়া চড়িয়ে প্রস্তুত। খগেনকে দেখেও দেখলেন না। খগেনের নমস্কারের বিনিময়ে প্রাণহীন প্রতি নমস্কার করলো মাত্র।

খগেন শ্যামদারোগাকে শোনালো সমস্ত বৃত্তান্ত। এমন কি সন্দেহের কথাও জানালো। ভূতো রায় এই কাণ্ডের নায়ক তাও জানালো। অবিলম্বে ভূতোকে গ্রেপ্তারের পরামর্শ দিল।

দারোগা শুনলেন। পকেট থেকে টাইপকরা একটা চোথা খগেনের সামনে ধরে বললেন—

—আগামী কালই আমি বদলি হয়ে যাচ্ছি সুন্দরবনে। আমার কিছু করার নেই খগেনবাবু। মেজবাবুর সাথে কথা বলুন। নমস্কার।

খগেনের মুখের ওপর একরাশ কালো ধোঁয়া থুকিয়ে দারোগার জিপ চলে গেল বিরলাপুরের দিকে।

॥ ১১ ॥

গঙ্গা তুমি কোথা থেকে আসছো ?

মহাদেবের জটা থেকে।

মহাদেবের বিশাল জটা থেকে গঙ্গা তরতরিয়ে নেমে আসছে পৃথিবীতে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিতা। পাহাড়ি বন্ধুর পথ অতিক্রম করে, নতুন নাম নিয়ে সমভূমিতে নেমেছে ভাগীরথী নামে। সর্পিল বিচিত্র পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বিচিত্র রূপে।

বিচিত্র তার পথ পরিক্রমা।

পুণ্য প্রবাহিনী ভাগীরথী।

সগর পুত্র ভগীরথের আহ্বানে—সগরের ষাট হাজার পুত্রের উদ্ধারের জন্য নেমে এসেছে সমতলে। মিশেছে সাগর সঙ্গমে। উর্মি চঞ্চল সাগরের বুকে লীন হয়েছে। চলার পথে বিস্তীর্ণ দু'পারে গড়ে তুলেছে গ্রাম-শহর জনপদ। ভাগীরথীকে নির্ভর করে বেঁচে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। আজকের সভ্যতা।

হাজার হাজার বছর অতিক্রম করে বিরামহীন বয়ে চলেছে ভাগীরথী। বয়েস বেড়েছে, শরীরে আশ্রয় করেছে জরা। সর্পিল পথ আরো সর্পিল হয়েছে, গতি কমেছে। হাজার হাজার বছর পরিক্রমায় পথের দু'পাশে উগরে দিয়েছে বালির চর। তৈরি করেছে অসংখ্য হাঁসুলির বাঁক।

এমনি এক হাঁসুলির বাঁকে বিষ্টুপুর গ্রাম।

ছোট গ্রাম। একঘর উচ্চবর্ণের বাস। তিনঘর মুসলমান। বাকি সবাই রাজবংশী। পেশায় মাছমারা। ভাগীরথীর বুকে আশ্রয় করে এরা বেঁচে আছে কয়েকশো বছর। এদের পূর্বপুরুষেরা একদিন 'বন কেটে বসত' গড়েছিল এখানে। গহন অরণ্য আর হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে অসম লড়াই করে ভয়াল সুন্দরবনকে ঠেলে দিয়েছে সুদূর দক্ষিণে, সাগরের কিনারে।

এখানে প্রতিষ্ঠা করেছে মানুষের অধিকার।

তারাই এ গ্রামের নাম রেখেছিল বিষ্টুপুর।

ভাগীরথীর বক্ষের অফুরন্ত মৎস্য সম্পদকে নির্ভর করে এদের পূর্ব-পুরুষেরা জীবন ধারণ করেছে। আজ তাদের উত্তরপুরুষ—কার্ত্তিক নবীন শ্রীকান্ত হাবুল মৈনুদ্দিন কালীপদ বাদল শম্ভুরাও বাঁচতে চাইছে। কিন্তু সেদিনের সম্পদশালিনী রাজমাতা আজ রিক্তা। কয়েক হাজার বছরের ধারাবাহিক অত্যাচারের ক্ষত বুকে নিয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে। যে ভাগীরথী একদিন সগরের ষাট হাজার পুত্রের প্রাণ দিয়েছে সেই জননী ভাগীরথী আজ করজোড়ে প্রাণভিক্ষার্থী মানুষের কাছে। মানুষের তৈরি বিশাল আকারের ড্রেজার বুকে পেস্‌মেকারের মত প্রাণস্পন্দনকে সচল রেখেছে। অবশ্যই মানুষের প্রয়োজনে। মানুষের স্বার্থে।

না, ভাগীরথী মৃতা নয়। জীবিতা এখনো, বার্ধক্যে জরাক্রান্ত, ন্যুব্জ। বুকের সম্পদ কমেছে। ভাগীদার বেড়েছে, পুঁজির কালো থাবা চেপে বসেছে বুকে। তাই বিস্তীর্ণ দু'পাবে গড়ে উঠেছে আধুনিক জনপদ। সভ্যতার বর্শাঘাতে বুকে রক্ত ঝরছে অবিরাম।

যে মানুষবা একদিন ভাগীরথীর বুকের গহিনে লুকিয়ে থাকা সম্পদেব সন্ধান পেয়ে করজোড়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিল—

মাগো। তোমার তীরে আমরা বসত গড়বো। পূজো দোব। তুমি আমাদের দু'হাত ভরে দাও মা। যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রেখো আমাদের বংশধরদের।

আজ ভাগীরথীর বুকে চিরে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না সেই মানুষদের উত্তরপুরুষরা। যেটুকু সম্পদ এখনো অবশিষ্ট আছে সেখানে লুটেরার হানাদারি। মহাজনের কালো হাত লুণ্ঠন করছে সদর্পে।

ওবা শুধু শ্রমদাস। সম্পদ আহরণ করে তুলে দিচ্ছে মহাজনের ঘবে। একদিন নয়। দু'দিন নয়। দিনের পর দিন মাসের পর মাস।

জীবনের পর জীবন।

তাল নারকেল সুপারি খেঁজুর শেয়াকুল আশশ্যাওড়া বৈঁচি। ঝোপঝাড় লতা গুল্ম বট, অশ্বত্থ, নিম, সীম, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ও অন্যান্য গাছ গাছালির ছায়া ঘেরা ছোট গ্রাম বিষ্টুপুর।

ধান ক্ষেত। জল টলটলে পুকুর।

এক প্রান্তে প্রবাহিনী ভাগীরথী। কালো কালো মানুষ। মাটিব দেওয়াল। খড় আর টালির ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট ঘব। যৌবন চলকে ওঠা যুবতী বৌ ঝি। কালো নগ্ন রুগ্ন অপুষ্টিবাহিত ছেলেমেয়ে নিয়ে বিষ্টুপুর গ্রাম।

এখানে সূর্য উদয় হয়। অস্ত যায়। বৈশাখ আসে, জ্যৈষ্ঠ আসে। আসে সব ঋতু। পৃথিবীর আবর্তন চলে প্রতিক্ষণ। শিশু জন্মায়। মরে অপুষ্টিতে। সংক্রামক রোগে। যাবা এসব বাধা অতিক্রম করে বাঁচে।

বড় হয়। বয়স বাড়ে। বালক যুবক হয়। বালিকা যুবতী হয়। বুকের সীমায় ঝলমলিয়ে ওঠে রক্ত গোলাপের ফুল।

আধুনিক সভ্যতার রঙীন বাতাস বিষ্টুপুরে পুরোপুরি লাগেনি বটে। তবু এখানকার মানুষরা আধুনিক সভ্যতার খোঁজখবর রাখে কিছু কিছু। শহরের ইট, কাঠ লোহার আস্তরণ ভেদ করে মাঝে মধ্যে শহরের চমকদার বাতাস এসে পৌঁছায়। নিস্তরঙ্গ বাতাসে তরঙ্গ তোলে। শহরের চোখ ঝলসানো আলো ছিটকে এসে চমকে দেয় এখানকার মানুষদের। ইদানীং পাকা রাস্তার কল্যাণে দূরকে করেছে নিকট। পরকে করেছে আপন। যে কোলকাতা এতদিন ছিল স্বপ্ন ঘেরা সুদূরের নীহারিকা। এখন তা বাস্তব। ঘরের কানাচে। বাসে চড়লেই তিন ঘণ্টার মধ্যে হুস করে পৌঁছে দিচ্ছে। উন্নতি হচ্ছে গ্রামের। নানান সুযোগ সুবিধা বাড়ছে। কিন্তু বিপরীত ক্রিয়ায় শহর তথা কোলকাতার কলুষ বাতাস গ্রামে প্রবেশ করছে। ঘুণ ধরছে গ্রামের শরীরে।

পিছিয়ে পড়া বিষ্টুপুর ধীরে ধীরে আধুনিক সভ্যতার আলোয় আলোকিত হচ্ছে।

খগেন জানার মেয়ে কোলকাতার কলেজে পড়ে। রায়েদের ব্যবসা কোলকাতার সাথে। ইদানীং গ্রামের অনেকেই শহর মুখি হতে বাধ্য হচ্ছে। চাষ করে, নৌকা বেয়ে পেট চলছে না। শহরে গিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা অথবা হকারীতে অংশ গ্রহণ করছে। তারা নিয়মিত যাচ্ছে কোলকাতায়। অনেকে বাপ পিতামহের পেশা ত্যাগ করে শহরে যাচ্ছে। অনেকে বিরলাপুর চটকলের শ্রমিকের খাতায় নাম লিখিয়েছে। তাতে আর যাই হোক চলমান অনাহারের গতিরোধ হয়েছে। সপ্তাহান্তে নগদ টাকা আসছে হাতে।

বিষ্টুপুরের কয়েক মাইল উত্তরে প্রাচীন শ্যামগঞ্জ ধীরে ধীরে নগরায়িত হচ্ছে। শিল্প নগর রূপে গড়ে উঠছে বিরলাপুর নাম নিয়ে। চটকল, সুতাকল, কারবাইড, কার্পেট, পাওয়ার হাউস বসেছে। অনেকগুলো চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া উঠছে রাতদিন। আকাশছোঁয়া চিমনির কালো

হাত ইশারায় ডাকছে নিকটবর্তী গ্রামের মানুষদের। শোষণের গিলোটিনকে নগদ টাকার মোড়কে লুকিয়ে আধুনিক সভ্যতা ডাকছে। পুঁজিবাদের রক্ত মাখা হাত ডাকছে—আয় কাছে আয়।

সব হারিয়ে যতান একদিন পথে নেমেছিল। জোতজমি কোন কালেই ছিল না। বাসস্থান ছিল একটা। কোনরকমে মাথাগুঁজে থাকার মত। কলেরায় মরেছিল বাপ মা। শারীরিকভাবে ছিল দুর্বল। নৌকার হাল বা দাঁড় ধরে সুবিধা করতে পারতো না। চাষের কাজেও অন্যদের সমকক্ষ হতে পারেনি। অপাংক্তেয় উপহাসের পাত্র ছিল সবার কাছে। সবাই উপাদেশ দিত। জ্ঞান দিত। করুণা দেখাতো।

যতীন একদিন সবার অলক্ষে চলে গিয়েছিল বিরলাপুর। পাঁচজনকে ধরে করে ঢুকেছিল চটকলে। এখন সে চট শ্রমিক। চটকলিয়া। সাত দিন অন্তর অন্তর নগদ টাকায় বেতন পায়।

এখন চেনা যায় না যতীনকে। আগে, বছরে দু'টো ধুতি জুটতো না। এখন পরনে টেরিকটের ফুলপ্যাণ্ট, বুশ শার্ট, হাতে ঘড়ি। বিড়ির বদলে মুখে থাকে লম্বা লাঠি সিগারেট। কাঁধে চামড়ার থলিতে ক্যাসেট রেকর্ডার। ঝমাঝম হিন্দি সিনেমার গান বাজে। রুক্ষ চুল এখন তৈলাক্ত, গায়ের রঙ ফর্সা হয়েছে। দেশেব কালো কালো মানুষগুলোর পাশে তাকে অন্য গোত্রের মনে হয়। পড়শিরা বলে—

যতীন শহরে গিয়ে বাবু হয়েছে। ভদ্দর নোক হয়েছে। যতীনও ব্যবহারে আচারে তেমন ভাব দেখাবার চেষ্টা করে। যেন সত্যি বাবু হয়েছে। এদের থেকে পৃথক। ভদ্দর নোকের একজন।

স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে জলভরা কলসী কাঁখে নিয়ে ঘাটের ওপর এসে দাঁড়ালো যমুনা।

পুকুরটা বাড়ি থেকে একটু দূরে। যমুনাদের নিজস্ব পুকুর নেই। ভুঁয়েদের এঁদো পুকুরটাই ব্যবহার করে।

আকাশের দিকে তাকালো। বেলা অনেক হয়েছে। সূর্যের অবস্থান

আকাশের মাঝামাঝি। আকাশ দেখে সূর্যকে গালাগাল দিল যমুনা।

—মুখপোড়ার আর দেরি সয় না! সোকাল না হতি হতি দু'পহর ব্যালা। ঘোড়ার মুখে জিন দিয়ে এয়েছে কালামুকো। ঢ্যামনা।

যমুনার সব কাজই দেরিতে হয়। শুতে দেরি উঠতে দেরি। ঘুমুতে দেরি। রান্নায় দেরি। কান্নাতেও দেরি। পড়শিরা, মহিলারা বলে—মাগী কুড়ে।

কুমারী জীবনে মায়ের মুখ শুনতো। এখন অন্ধ শাশুড়ির গালাগাল শোনে। গায়ে মাখে না। নিজেকে নির্দোষও ভাবে না। করছি—করবো করতে করতে সব কাজে দেরি হয়ে যায়। কোন কাজই সময়ে হয় না। একটা দেরিতে হলে পরেরটাও দেরি হয়। এর জন্যে দুঃখ, অনুশোচনা করে না যমুনা। তার বিশ্বাস সব কাজ তাড়াতাড়ি করলে কী এমন স্বর্গ লাভ হবে। আর দেরি করলে মহাভারত কী এমন অপবিত্র হবে!

যমুনা চলে তার বিশ্বাসে। তাতে কে কি ভাবলো। কে কি বললো খুব একটা গায়ে মাখে না। মানুষের মুখ চুপ করে থাকে কী করে। ওরা বলছে বলুক। যত পারে বলুক। মনের সুখে বলুক। মাঝে মাঝে অবশ্য শাশুড়ির খিট খিট অসহ্য হয়ে ওঠে।

অন্ধ শাশুড়িকে নিয়ে হয়েছে জ্বালা। বুড়ির চোখ নেই কিন্তু কান খরগোশের মত সতর্ক। সামান্য শব্দেই টের পায়।

—বউ কিসের শব্দ হোল?

—হুলো বেড়ালটা পালালো। যমুনা ম্যানেজ করে।

ফিসফিস কথা শুনেও মানুষ চিনতে ভুল করে না বুড়ি।

—কে কথা বলছে বউ? যতীন? ও মুখপোড়া কখন এলো?

যমুনা উত্তর দিলে ভাল। না দিলে পুনরায় জানতে চাইবে। তাতেও উত্তর না পেলে আর রক্ষা নেই। ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধাবে। মুখ ছোটাবে বুড়ি। যমুনার বাপ-বাপন্ত করবে। তাতেও যদি উত্তর না পায় তাহলে বুড়ির মুখে নোংরা খিস্তির বান ডাকবে। একেবারে কাঁচা নর্দমা। কোন নোংরা বুড়ির মুখে বাধে না। হুড় হুড় করে গড়ায়। রাজবংশী ঘরের

মেয়ে যমুনা। পাল্লায় সেও কম যায় না। যেদিন মন মেজাজ ভাল থাকে সহ্য করে! উল্টে দু'চারটে ফুট দিয়ে বুড়িকে তাতিয়ে মজা করে। যেদিন কোন কারণে মেজাজ বিগড়ে থাকে সেদিন প্রথমে বুড়ির প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তাতে বেতাল হয় বুড়ি। যমুনার বাপ-মাকে এনে ফেলে নোংরা মুখের নর্দমায়।

শেষ পর্যায়ে এসে যমুনাও মুখ ছোটায়। পাল্লা দেয় বুড়ির সঙ্গে। প্রমাণ করে সমকক্ষতার। কে কাকে কতটা নোংরায় নামাতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলে। উপযুক্ত বাপ-মায়ের সন্তান দু'জনেই। পরাজয় স্বীকার করে না। শেষে বুড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়লে যমুনার শুরু হয় অন্য পর্ব।

অন্ধ শাশুড়ির হাত ধরে বসিয়ে দেয় কটকটে রৌদ্রের মধ্যে। শেষে গালাগাল দিয়ে সমাপ্তি টানে।

—শুকনি। কানি। ঢেম্‌নি। তোকে আজ খেতে দুবুনি। দেখি তোর কোন্ নাঙ খাওয়ায়।

ভাত না দেবার ভয় দেখায়।

যমুনার শেষ অস্ত্র খেতে না দেবার হুমকি। এক কথাতেই বুড়ি ঝিমিয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে বহুবার অনাহারে রেখে শায়েস্তা করেছে বুড়িকে।

বুড়ির কণ্ঠ সপ্তম থেকে প্রথমে নেমে আসে হঠাৎ। শেষে মিন মিন করে। হাঁপায়। কাঁদে। নিজেকে, ভাগ্যকে, ঈশ্বরকে গালাগাল করে। তাকে শত্তুরের হাতে রেখে যাবার জন্যে মৃত স্বামীকেও গালাগাল করে। গত জন্মের পাপের কথা স্মরণ করার চেষ্টা করে।

অস্ত্রটা যমুনার কাছে বেশ কার্যকরী।

বুড়িও রাগ পুষে রাখে। ছেলে ফিরলে এক কথাকে দশ কথা করে শোনায়। ব্যস স্বামী-স্ত্রীতে বেধে যায় ধুন্ধুমার। বুড়ি ছেলেকে উৎসাহ দেয়। বউয়ের নামে অনেক কথা শোনায়। অনেক সময় এমন হয়েছে পাড়া পড়শিরা এসে থামিয়েছে যমুনা-শম্ভুর মারামারি। যেদিন শম্ভুর

মন ভাল থাকে, জালে অনেক মাছ পড়ে, ভালমুখে থাকে সেদিন মায়ের কথার গুরুত্ব দেয় না। স্ত্রীর সাথে হেসে কথা বলে। ঠাট্টা মস্করা করে। মাকে শুনিয়ে নকল ঝগড়ার মহড়া দিয়ে মাকে সান্ত্বনা দেয়। আর যেদিন মদ খেয়ে ঘরে ফেরে সেদিন তার মেজাজ থাকে রাজা মহারাজার মত। মায়ের অভিযোগ শুনে অতিরিক্ত মাতৃভক্ত হয়ে ওঠে। কোন কথা শোনে না। দমাদ্দম হাত চালিয়ে দেয় যমুনাকে লক্ষ্য করে। ওসব যমুনার গা সওয়া। দু'চার ঘা খেলো। হজম করলো। সময় সুযোগ বুঝে পাল্টা দিয়ে দিল দু'চার ঘা। কিছুক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি হল্লা করে সব মিটে গেল। শম্ভুর মারে যমুনার শরীরের ব্যথা কমলো। শেষে প্রাত্যহিক নিয়মে স্বামী শাশুড়িকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে অনেক রাতে বিছানায় গেল। ব্যস সব মিটে গেল। ভাব হয়ে গেল স্বামী স্ত্রীতে। সহজে রাত কাবার হলো।

মানুষের জীবনের বহু অঘটনের সূত্রপাত বিছানা থেকে। আবার বহু অঘটনের সমাপ্তি সংগীত বেজেছে বিছানা থেকেই। পৃথিবীর দুই যুযুধান রাষ্ট্রপ্রধানদের এক বিছানায় শোওয়াতে পারলে যুদ্ধ সম্ভাবনা অনেকাংশে লাঘব করা যেত। এবং তারা যদি বিপরীত লিঙ্গের হয় তাহলে তো কথাই থাকে না।

যমুনার ঘুম ভাঙে দেরিতে। আজ আরো দেরি হলো। দাওয়ার মুড়োয় বসে অনেকগুলো হাই তুললো। হাত মুখ ধুয়ে এক বাটি খুদভাজা রয়ে সয়ে পেটে চালান করলো। কুমারী জীবন থেকে অভ্যাসটা সঙ্গে এসেছে। সকালে ঘুম ভাঙলেই ক্ষিদে পায়। মুখে কিছু না দিলে খোয়ারি কাটে না। শরীরটা ভাল ঠেকছে না আজ। রাতে মশা আর ছারপোকার উৎপাতে ভাল ঘুম হয়নি। শম্ভুকে ছারপোকা মারার ওষুধ আনতে বলে বলে হয়রান। শরীর অলস অলস, ভাল ঘুম না হবার কারণে। ইচ্ছা করছে পুনরায় একটা ঘুম দেয়। কিন্তু বুড়ি শুকনি যে দাওয়ার ও মুড়োয় বসে আছে।

অনেক বেলা পর্যন্ত ঝাটপাটের শব্দ না পেয়ে বুড়ি সকাল থেকেই গজ গজ করছে।

—অনক্ষী। গতরখাগি। বাঁজা ধুম্‌সি মাগী। সূয্যি আগাশে উঠলে তবে ঝাটপাট করবি। তোর মা মাগী কি সোমসারের কিছু কাজ শেখায়নে? নক্ষিছাড়ি। হতচ্ছাড়ি। এমন করলে যে নক্ষি ছেড়ে যায়।

নক্ষিছাড়ি। বাঁজা বিশেষণটা যমুনাকে প্রায় শুনতে হয়। বুড়ি সামান্য কারণে শোনায়, শাসায়।

—খেয়ে খেয়ে মাগীর গতর তুঁদরো হচ্ছে। খোদার খাসী বিয়োবার নামে ঢন ঢন। টাঁড় মাগী। দোব দূর করে। দূর'হ। নজর ছাড়া'হ। আবার ব্যাটার বে দোব। লতুন বউ আনবো।

পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে যমুনার। এখনো সন্তানহীনা। স্বভাবতই শরীরের গঠন ভাল। স্বাস্থ্য অটুট।

জলভরা কলসীর মত যৌবন চলকে উঠছে দেহের কানায় কানায়। কিন্তু যমুনাদের সমাজে সন্তান না হওয়া অভিশাপ। সন্দেহের। ঘৃণার। লজ্জার। প্রতিবেশীর কাছে উপহাসের উপকরণ।

কিন্তু কেন? কেন সে বন্ধ্যা? প্রশ্নগুলো বার বার উদয় হয়েছে যমুনার মনে। কে এর জন্য দায়ি। যমুনা? না শম্ভু? কে? উর্বরা জমিতে যদি ফসল ফলাতে না পারে শম্ভু যমুনা কি করতে পারে। সাধ্য মত তার ক্ষেতকে সে চাষযোগ্য করে রেখেছে। সজীব সরস করে রেখেছে। সেও তো মনে প্রাণে হৃদয়ে বুভুক্ষু অতৃপ্ত। যমুনা কামনা করে কোলে ছোট খোকন আসুক। আধো আধো স্বরে কথা বলুক। ছোট ছোট পায়ে ঘরে দাওয়ায় উঠোনে ঘুরে বেড়াক। বুকের উত্তাপে ঘুমাক। সে নিশ্চয় চায় ফলবতী হতে। ফুলে ফলে ভরে উঠুক শাখা প্রশাখা। ঘর দোর সংসার জীবন। কিন্তু যমুনার হৃদয়ে অতৃপ্তির জগদ্দল চেপে আছে। তার বার বার মনে হয়েছে, সন্দেহ হয়েছে স্বামী অযোগ্য। প্রতিযোগিতার চরম মুহূর্তে শম্ভুকে ক্লান্ত পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে দেখেছে। এখনো প্রতি রাত শেষ হয় অতৃপ্তির লজ্জা মাথায় নিয়ে।

মাঝে মাঝে যমুনার অতৃপ্ত সত্ত্বা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বুড়িকে দু'কথা শোনাতে ইচ্ছা করে। কিন্তু গোপন লজ্জার কথা শোনাতে পারে না। চিরন্তন নারীসত্ত্বা বাধা দেয়। বিশাল শূন্যতার হাহাকার বুকে নিয়ে ঠাকুর দেবতা পীর ফকির মানত মানসিক করেছে। সব ব্যর্থ।

কিন্তু যেদিন মায়ের কথাগুলো শম্ভুর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় সেদিন যমুনার মুখের আগল থাকে না। বাঁধ ভাঙা বন্যার মত হুড় হুড় করে ক্ষোভ জ্বালা অতৃপ্তি স্বামীর কাছে উজাড় করে দেয়। খিস্তির ঢেউ উগরে দেয়। যমুনার মূর্তি দেখে থমকে যায় শম্ভু। কে এর জন্যে দায়ি? তাকেও ভাবায়।

নগেন ভুঁয়ের পুকুর পাড় ঘুরে জানাদের তেঁতুল গাছের নিচে গিয়ে যমুনা দেখলো সামনের দিক থেকে আসছে যতীন। ভদ্দর নোক। আজ রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন।

—কী গো ভদ্দর নোক। কখন এলে গেরামে?

প্রথম কথা বললো যমুনা। যৌবন ধুয়ে আসছে সে। সায়া ব্লাউজহীন শরীরে লেপ্টে বসে গেছে শাড়ি। বাম কাঁধে জলভরা কলসী। ডান হাতে ভুঁয়েদের পুকুর থেকে তোলা কলমি শাকের আঁটি। পিঠে খোলা এলোচুল। বন্ধ্যা নারীর প্লাবিত যৌবন বড় প্রকট। ভীষণ স্পষ্ট। যতীন দু'চোখের দূরবীনে দেখলো যমুনাকে! যমুনার শরীরকে। জরিপ করলো যমুনার যৌবনকে।

—কাল সন্দে ব্যালায় এয়েছি গো সখি। তারপর কেমন আছো?

—আমাদের আবার থাকা না থাকা। কোনরকমে বেঁচে আছি। তুমি শওরে গিয়ে বাবু হয়েছো। আমাদের দিকে নজর দেবে কেন?

—আরে ছিঃ ছিঃ কি যে বলো। নজর দিতে তো চাই। তুমি শুধু নারাজ···

—এ্যাই মিনসে আবার সেই কথা। চোখ মটকালো যমুনা।

যতীন আর শম্ভুর সখ্যতা আজকের নয়। বহুদিনের। তখন দু'জনার বয়স কৈশোরের সীমায়। উভয় উভয়ের বন্ধু। হৃদয়ের প্রতিবেশী। সেই সুবাদে যমুনার সাথে যতীনের সম্পর্ক একটু ঢিলে ঢালা। ফষ্টি নষ্টি করে দু'জনেই। গ্রামীণ অশালীন ইঙ্গিত থাকে একটু আধটু। যমুনা প্রশ্রয় দেয়। কৌতুক অনুভব করে। পাল্টা মস্করা করতে ছাড়ে না। তার মধ্যে অশালীনের গন্ধ যে থাকে না তা নয়। তবে তা নিরামিষের শামিল। নেহাত সাদা মাটা।

যতীন বললো—কতবার বলিচি এখেনে পড়ে থেকে শুকিয়ে মরবে কেন আমার সঙ্গে বিরলাপুর চলো। তোমাকে রাজরানী করে রাখবো। বুড়ো ভাতারের মায়া কাটাতে পারছুনি। সতী সেজে বেড়াচ্ছ। তোমার এই রূপ যৈবন মাঠে মরে যাচ্ছে গো।

সিক্ত বসনা যমুনাকে দেখে পুনরায় বললো যতীন।

—না। শালা শম্ভেটা হারামির ঝাড়। তোমাকে বড় কষ্ট দেয়।

কষ্টের কথা শুনে সজল হয়ে উঠলো যমুনার চোখ। আহা—পর মানুষটার তবু চোখ আছে। নিজের মানুষটা গোঁয়ার গোবিন্দ। তেড়েল মাতাল। একদিনও ভাল করে দেখলো না ঘরের মেয়েমানুষটাকে। নিজের মন্দ-মানুষ যদি দূর ছাই করে তাহলে বেঁচে থেকে কি লাভ। মরণ ভাল।

—যা হোক তুমি পর মানুষ তোমার নজর আমার দিকে পড়েছে ঘরের মানুষ তো দেখতে পায়নে। দেখবে বুড়ি শুকনির জ্বালায় একদিন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবো। আমার আর সহ্য হয় না।

অবাক চোখে তাকালো যতীন।

—সে কী! এমন যৈবন মরবে কী গো! সারাজীবন চুষলে ফুরোবেনে। পাকা আঁবের মতন টুসটুসে যৈবন পুড়ে ছাই হোক কেউ চায়। আহাঃ যৈবন তোমার না-টস্‌কাক। পাঁচজনে দেখুক। হিংসে হোক। ফেলে ছড়িয়ে আমাকে একটু দয়া করো। চেখে দেখি। তারিফ করি।

যমুনার দৃষ্টি ঘুরে ফেরে যতীনের মুখের আনাচে কানাচে। কী যেন

বলতে চায় মুখপোড়া মিন্‌সে। বোঝার চেষ্টা করে যতীনের কথার আড়ালে অন্য ইঙ্গিত পিছলে যাচ্ছে কি? নারীমনের বাঁধন ছেঁড়া কৌতূহলের ডানা পাকসাট মারছে যমুনার মনের গহনে।

—শম্ভেটা কোথায়? অন্য কথায় পিছলে যায় যতীন।

—শুকোয় গেছে।

—ফিরবে কবে?

—কী জানি মিন্‌সে কবে ফিরবে। যমুনার কণ্ঠে বিরক্তি।

আমাকে কি বলে যায়? কানি বুড়ির সাথে বেশি পিরিত, সেই বলতে পারে। শুনছি ইবার ফিরতে দেরি হবে। খগেন জানার নৈকোয় যায়নে, বিষ্টুদাসের বহরে গেছে।

—কতদিন গেছে?

—হ্যাঁ তা হোলগে পেরায় দেড় হপ্তা। তুমি আগেরবার যিদিন চলে গেলে তার পরের দিন গেছে।

ভিজে কাপড়ের ঝরা জলে পথের মাটি কাদা হচ্ছে। ইতিউতি সতর্ক তাকিয়ে যমুনা বললো—

—এ্যাই আমার জন্যে কী আনবে বলেছ্যালে এনেছো?

গত সপ্তাহে যতীন গ্রামে ফেরেনি। তার আগের সপ্তাহে যখন এসেছিল তখন শম্ভুকে এড়িয়ে যমুনাকে বলেছিল—

—এবার যখন আসবো, তোমার জন্যে এমন একটা জিন্নুস আনবো তুমি অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু স্যাঙাৎকে বলতে পারবে না।

যমুনা অনেক কৌতূহল চেপে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—স্বামীকে বলবে না। এখন যতীন দুষ্টুমির হাসি হেসে বললো—

—এনিছি গো এনিছি। কিন্তু তুমি আমাকে কী দেবে বলো?

—জিন্নুস যদি পসন্দ হয় তবে তো।

—এমন জিন্নুস তোমার পছন্দ হবেই।

—তাহ'লে যা চাইবে তাই পাবে।

—সত্যি দেবে?

—হ্যাঁ দোব। জোর দিয়ে বললো যমুনা। যম্নির কথার নড়চড় হয় না।

—তিন সত্যি করো।

—দোব। দোব। দোব। এবার হলো? বলো কী এনেছো?

পুকুর পাড় ঘুরে কে যেন এদিকে আসছে। যমুনা সতর্ক হলো।

—এখন পথ ছাড়ো। মানুষ আসছে।

—যদি না ছাড়ি?

—তোমার বাপ ছাড়বে।

যমুনা সদর্পে যতীনের দিকে আগালে বাধ্য হয়ে পিছু হটলো যতীন। পাশ দিয়ে যাবার সময় যমুনা ফিসফিসিয়ে বললো—

—রাতের ব্যালায় এসো অনেক কথা আছে। ওটা নিয়ে এসো।

সিক্তবসনা একটা উদ্দাম যৌবন চলে গেল যতীনের সামনে থেকে। ভিজে চুলের অচেনা গন্ধ লাগলো নাকে।

যতীন অবিবাহিত যুবক। কিন্তু বিরলাপুর চটকলে চাকরির সুবাদে সে কুমার নয়। পেশাদার অনেক নারীর যৌবন দেখেছে। কিন্তু যমুনা। যতীনের কাছে অতুলনীয়া। বাজারী মেয়েদের রূপ আছে। ঠাট বাট ঠমক চমক আছে কিন্তু যৌবন তাদের বহু ব্যবহারে জীর্ণ। বিধ্বস্ত। ক্ষতবিক্ষত। ম্যাড়মেড়ে। জৌলুষ আছে স্বাদ নেই।

যমুনার বন্য যৌবন যতীনের কাছে কালবৈশাখী। অথবা পাহাড়ি ঝোরা। বর্ষার ভরা নদী। কোটালের বান।

সকাল থেকেই যমুনা উদাস। হাজার ভাবনা চিন্তার জট মনের ভেতর। পাওয়া না পাওয়া, আশা নিরাশার, সুখ দুঃখের হাজার ফুলকি জ্বলছে বুকের গভীরে। সব মানুষের ভাগ্য কেন সমান হয় না। পৃথিবীর সবাই কেন সমান সুখী নয়! শম্ভু কেন যতীনের মত নয়। যতীন যদি শম্ভু হতো!

অনেক কিছু না পাওয়ার হাহাকার যমুনার বুকে মরুর ঝড় তুলছে।

আজ সময়ের ঘড়ি যেন চলছে না। চলতে চাইছে না। কখন সন্ধ্যা হবে। রাত হবে। ভদ্দর নোকের আনা জিনুসটা দেখার কৌতূহল তার বুকে পূবালী বাতাসে ভরা নদীর উত্তাল ঢেউ তুলছে। কী এমন জিনুস! সাত রাজার ধন মানিক? নাকি পূর্ণিমার চাঁদটাই ধরে এনেছে ভদ্দর নোক।

সময়ের গতিকে হার মানিয়ে যমুনার মন চলছে। কখন রাত হবে। সন্ধ্যা রাতেই রান্নার ঝমেলা মিটিয়ে নিয়েছে। শাশুড়ির শরীর ভাল নেই। পেটের গোলমাল। সন্ধ্যার পূর্বেই বুড়ি বিছানা নিয়েছে।

পরিচিত পদশব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে যমুনা।

গরীবের মেয়ে যমুনা। গরীবের ঘরনী। জীবনটাই দুঃখে দুঃখে ভরা। তেইশ বছর জীবনে অনেক সুখের স্বপ্ন দেখেছে। আর পাঁচজন নারীর মত স্বামী-পুত্র-কন্যা ভরা সংসারের স্বপ্ন এঁকেছে একান্তে। কিন্তু সুখের সামান্যতম কণাও ধরা দেয়নি তার প্রসারিত জীবনে। কুমারী জীবন থেকে যা কিছু কামনা বাসনা ছিল তার একটিও এসে দাঁড়ায়নি যমুনার সামনে। যা পেয়েছে তা কোনদিন চায়নি বরঞ্চ ভয় করেছে। ঘৃণা করেছে।

অতৃপ্ত মন। অতৃপ্ত কামনা বাসনার সামনে আজ কল্পতরু রূপে দাঁড়িয়ে আছে যতীন। একটা মানুষ। একজন পুরুষ। একটা দুরন্ত সফল অস্তিত্ব। দুর্দান্ত প্রেক্ষাপট।

স্বামীর ঘরে আসা থেকেই দেখছে যতীনকে। দেখেছে তার পরিবর্তন। যে মানুষটা কাজের জন্য মহাজনের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতো ভিখারীর মত। দিনান্তে আহার জুটতো না। সেই যতীন শহরে গিয়ে স্বনির্ভর হয়েছে, বাবু হয়েছে। ভদ্দর নোক হয়েছে। এখন সে অনেকের ঈর্ষার পাত্র।

যমুনা উপলব্ধি করছে ভাগ্য ভগবান গড়ে দেয় না। আপন হাতে গড়ে নিতে হয় ভাগ্যের ইমারত। যেমন গড়ে নিয়েছে ভদ্দর নোক।

যমুনার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে শম্ভু কেন ভদ্দর নোকের মত হলো না। পরক্ষণেই মনে হয়েছে শম্ভুটা পুরুষ মানুষ হলো কবে! পুরুষ মানুষ যদি কেউ থাকে সে যতীন। সে যদি শম্ভুর স্ত্রী না হয়ে যতীনের স্ত্রী হতো তাহলে কেমন হতো? ডালে ডালে পাতায় পাতায় সুখী হতো। ডানা মেলে উড়তো স্বপ্নের রাজ্যে, মুক্ত আকাশে।

এসব ভাবলে যমুনার বুকের গভীরে পাহাড়ি ধসের শব্দ শুনতে পায়।

কোথায় যেন একটা বন্দী পাখি ডানা ঝাপটায়।

রাত গহিনে এলো যতীন। যমুনা তখনো লম্ফ জ্বেলে অপেক্ষা করছে। বিলম্বে আসার জন্যে লাগসই একটা কৈফিয়ৎ পেশ করলো যমুনার সামনে।

সত্যি তো পুরুষ মানুষের কত কাজ। সবদিক সামলে তবে তো আসতে হবে। নিজের মনেই সহজ সমাধান করে নিল যমুনা।

—বুড়ি কোতায়?

—বুড়ি শুকুনি মরেছে। ওলাউঠো হয়েছে। গাঙধারে গেছে।

যতীনকে ঘরের মধ্যে মাচায় বসালো। সামনে জ্বলছে কেরোসিনের লম্ফ। আলোর থেকে কালি ছড়াচ্ছে বেশি। দপ দপ করছে মাঝে মাঝে।

একটা ঘরের মধ্যে যমুনা আর যতীন। অবশ্য প্রথম নয়। শম্ভু থাকা-কালীন বহুদিন এমন ভাবে গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা করেছে তিনজনে। চিরপরিচিত দৃশ্য।

আজকের অবস্থানটা পৃথক, শম্ভু নেই। রাত গহিন। শিয়াল প্যাঁচারা চাটছে রাতের শরীর। দু'জনে খুব কাছাকাছি। দু'জনে দেখছে দু'জনকে। দু'জনেই হয়তো বুকের গহিনে শূন্যতার পরিমাপ করছে মনের তুলাদণ্ডে।

—দেখি কী এনেছো ?

যতীন হাসলো।

—কাছে এসো। যতীনের সামনে এসে দাঁড়ালো যমুনা। একেবারে বুকের কাছাকাছি।

যৌবনের মদির গন্ধ সুড়সুড়ি দিল যতীনের নাকে। মহুলের মত নেশাধরানো সে গন্ধ। নারীর বুকের পৃথক গন্ধ আছে। পৃথক নারীর বুকের গন্ধ নিশ্চয় পৃথক পৃথক।

যতীনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে যমুনা। অবাক বিস্ময়ে যতীন দেখছে যমুনাকে। অল্প আলোয় যমুনার চোখ চকচক করছে। ও চোখ কি অন্য কথা বলছে ?

—কই দেখাও ?

—চোখ বন্ধ করো।

—কেন ? জানতে চাইলো যমুনা।

—করো না।

চোখ বন্ধ করলো যমুনা।

যতীন আর যমুনা

পুরুষ আর নারী।

প্রকৃতি আর পুরুষ।

ফিসফিস কথাবার্তা।

নির্জন রাত। কাছাকাছি। আরো কাছে। শরীরের গন্ধ। যৌবন চঞ্চল। আনন্দ হাসি। বুভুক্ষু হৃদয়ের ব্যাকুলতা। স্পর্শ। কম্পন। শিহঁরণ।...

যমুনার অতৃপ্ত মনের গভীরে ভদ্দর নোকের প্রতি ক্ষুদ্র একটা সহানুভূতির বিন্দু জমেছিল বহুকাল পূর্বে। লুকিয়ে ছিল আকাঙ্ক্ষার গহিনে। লালিত হচ্ছিল স্বপ্নের আঙিনায়। আজ নির্জনে, অনুকূল পরিবেশে সে বিন্দু বাড়তে বাড়তে ধস নামালো মনে, প্রাণে, হৃদয়ে। দেহে। রক্তের কোষে কোষে। শিরায় শিরায়। শরীরের অলিতে গলিতে। নিজেকে বিলিয়ে দিল রাতের অন্ধকারে।

অবগাহন করলো অনির্বচনীয় সুখের সমুদ্রে।

শেষ রাতে নিঃশব্দে চলে গেল যতীন।

নতুন আবেশ, নতুন অনুভূতি, নতুন অভিজ্ঞতার ক্লান্তিতে অবশ হয়ে অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকলো যমুনা। লম্ফ কালি ছড়াচ্ছে। আক্রার বাজারে তেল পুড়ছে অকারণে, একেই কি বলে সুখ? তেইশ বছর জীবনে আজ প্রথম অনির্বচনীয় সুখের ধারায় স্নান করলো। এখনো সে সুখের ঝিলিক শিরায় শিরায় চরে বেড়াচ্ছে। রক্তের কোষে কোষে কম্পন তুলছে। এ সুখ জন্ম-জন্মান্তরের সুখ। জীবনে অনেক কিছুই পায়নি যমুনা। আজ যা পেল তা স্বর্গ সুখের অধিক। শরীরের ছোট এই খাঁচায় এত সুখ লুকানো আছে আজ আবিষ্কার করলো।

যতীন চলে গেলে লম্ফের আলোয় তার দেওয়া উপহারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো যমুনা।

—ভারি সোন্দর তো! বড়নোকের মেয়েদের থাকে।

নিজেকে গর্বিত মনে করছে যমুনা। খগেন জানার মেয়ের যা আছে সে জিনিসের মালিক সেও। ব্লাউজের ভেতরে থাকলে দেখা যায়। যতীনের শেখানো কৌশলে আর একবার পরিধান করে পারা-ওঠা আয়নায় নিজেকে দেখে মনে মনে বললো—সোন্দর লাগছে কিন্তুন। সিনেমার মাগীদের মতুন।

তিন সপ্তাহ পর শম্ভু শুকোয় থেকে ফিরলে রাতে যতীনের দেওয়া উপহারটা দেখিয়ে স্বামীকে অবাক করে দিল যমুনা।

শম্ভু ভাবতেই পারছে না এই জিনিস যমুনার থাকতে পারে।

অবাক বিস্ময়ে স্ত্রীর বুকের দিকে তাকিয়ে বললো—

—খাপটা কোথায় পেলি?

—খাপ? খিলখিল শব্দে হাসলো যমুনা। তুমি একটা বুদ্ধু। একে খাপ বলে না। বলে—টাইট বডি। বড়নোকের মাগীরা বুকে বাঁধে।

—পেলি কোথায় ?

—পেলুম। রহস্যমাখা হাসলো যমুনা।

—কোথায় ?

—আইপুরের জাত থিকে কিনিছি গো মশাই। খুব সোন্দর নাগছেনে ? দেখ—আমাকে খগেন জানার ঝি-এর মতুন নাগছে কিনা।

শম্ভুর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো যমুনা।

—হুঁ—নাগছে। বললো শম্ভু।

নিজেও কম অবাক হচ্ছে না। যমুনা তার স্ত্রী। যমুনার অনেক কিছুই তার পরিচিত। শরীরের প্রতিটি ভাঁজ মুখস্থ। তবুও আজ সামান্য এক-টুকরো কাপড়ে অপরূপা দেখাচ্ছে যমুনাকে। বয়েস যেন কমে গেছে। কচি কচি লাগছে। সিনেমার মেয়েরা ওই পরে সাঁতার কাটে দেখেছে শম্ভু।

—ও তো বড় লোকেরা কেনে।

—আমার বুঝি বড় নোক হতে ইচ্ছা যায় না। তুমি কোনদিন কিছু দিয়েছো ? দাসী বাঁদী করে রেখেছো।

মেয়েলি কপট অভিমানে মুখ ফেরালো যমুনা।

সত্যি বটে বিয়ের পর থেকে কি আর দিতে পেরেছে যমুনাকে। মেয়েদের কত শখ সাধ আহ্লাদ থাকে। ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকে। কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে শম্ভু। যা উপার্জন করেছে পেটে দিতেই উবে গেছে। ইচ্ছা থাকলেও স্ত্রীর সাধ মেটাতে পারেনি। কতদিন ভেবেছে যমুনাকে একটা নাকছাবি গড়িয়ে দেবে। বিয়ের পরেই চেয়েছিল যমুনা। তখন বলেছিল সোনার। বছর দু'ই পরে বলেছিল রূপোর দাও। এখন আর বলে না। হয়তো ভুলে গেছে অথবা স্বামীর অক্ষমতার আয়নায় নিজের মুখের প্রতিফলন দেখে প্রত্যাহার করেছে নাকছাবির আশা। সুন্দর একটা শাড়ির শখ যমুনার অনেকদিনের।

মাঝে মাঝে শম্ভু ভেবেছে যতীনের মত চটকলের শ্রমিক হবে। নগদ পয়সা কামাবে। তাহলে যমুনার শাড়ি হবে, নাকছাবি হবে। চাই কি—

ভগবান মুখ তুলে চাইলে কোঠা বাড়িও হতে পারে। প্রতিদিন সকালে ন্যাতা টানার হাত থেকে রেহাই পাবে যমুনা। যতীনকে ঈর্ষা হয়। তার ঐশ্বর্যকে ঈর্ষা হয়। ঈর্ষা হয় তার সৌভাগ্যকে।

বছর খানেক পূর্বে যতীনের কাছ থেকে দশটাকা হাওলাত নিয়েছিল শম্ভু, আজো পরিশোধ করতে পারেনি। যতীন ভাল মানুষ—তাই চায়নি। বড় দিলের মানুষ। সাপ্তাহিক ছুটির দিন গ্রামে ফিরলে বন্ধুর জন্যে সিগারেট আনে, বিলিতি মদ আনে। একবার নক্সা দেওয়া গেঞ্জি এনেছিল। আশ্বিন মাসে পূজোর সময় শম্ভুর জামা আর যমুনার জন্যে ভাল শাড়ি এনেছিল।

যতীন শম্ভুর প্রাণের বন্ধু। হৃদয়ের প্রতিবেশী। তবুও ভাবনা বাধা পায় বিপরীত ভাবনায়। শম্ভুর ইচ্ছাটা ফিকে হয়ে যায়। জাল নৌকা মাছ আর গ্রাম ছেড়ে যেতে মন চায় না। ভয় করে। কলে কারখানায় মালিকের বহুরকম অত্যাচারের কাহিনী যতীনের মুখে শুনেছে। সে কাহিনী যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি নৃশংস।

যতীন অনেকবারই কথা প্রসঙ্গে শ্রমিক হবার প্রলোভন দেখিয়েছে। নিজের ঐশ্বর্য দেখিয়ে লোভী করার চেষ্টা করেছে। অনেকবার বলেছে—

—চলরে স্যাঙাৎ বিরলাপুরে; এখেনে থাকলে না খেয়ে মরবি। নাইন সদ্দারের সঙ্গে আমার ভাব-সাব আছে। বলে কয়ে একটা কাজ জোগাড় করে দোব। ভাল কাজ, শনিবার শনিবার লগদ ট্যাকা।

যমুনার দিকে তাকিয়ে বলেছে—কি গো মিতেনি তোমার কী ইচ্ছা?

—আমার আবার কি? তোমার মিতেকেই শুধোও। যেতে হয় যাবে, নাহলে যাবে না।

—তুমি?

—কত্তার ইচ্ছায় কর্ম মশাই।

ইচ্ছা অনিচ্ছার দোলায় দুলেছে শম্ভু। যতীনের প্রস্তাব গ্রহণীয় মনে হয়েছে। এভাবে বাঁচার অর্থ হয় না। পুরানো ধ্যান ধারণা আঁকড়ে

থেকে কী লাভ ? যতীন কি অ-সুখে আছে ? তুলনা করলে অনেক ভাল আছে। কিন্তু অন্ধ মায়ের কথা ভেবে যতীনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে। মাকে নিয়ে কেমন করে থাকবে চটকল বস্তিতে। সেখানে নাকি ছত্রিশ-জাতের ছোঁয়া-ছুঁয়ি। ঘাঁটাঘাঁটি। খোট্টা মেড়ুয়ার দাপটে ভদ্দর নোকের বউ ঝিদের মান ইজ্জৎ থাকে না। জোয়ান মেয়েমানুষ দেখলে হামলে পড়ে। ছিঁড়ে কুটে খায়।

হাজার দ্বন্দ্বের টানা পোড়েনে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি শম্ভু। নিরুপায় হয়ে গ্রামের মাটি কামড়ে পড়ে আছে। এখানে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, বঞ্চনা আছে। মহাজনের হয়রানি আছে। তবু তো গ্রামে আছে। এখানকার মাটি যে বড় আপন। চোদ্দ পুরুষের জন্মভিটে।

আগে যতীনের গ্রামে ফেরা ছিল অনিয়মিত। এখন অবশ্য রবিবারটা গ্রামে কাটায়। বলে—

—বাপকেলে ভিটে, প্রতি হপ্তায় একবার করে দেখে যাই। তুলসী-তলায় বাতি দিই। মরা বাপ মা সগ গে গিয়ে শান্তি পাক।

দিন যায়। সাহস বাড়ে যতীনের। সাহস বাড়ে যমুনার। তার শরীর বড় জ্বালায়। শবরীর মত রবিবারের পথ চেয়ে থাকে। লজ্জার প্রথম পর্বের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে পূর্বেই। এখন সংকোচের বেড়া টপকে সুখের বাগানে বিচরণ করতে মন আকুল হয়।

অসতর্কতায় ছিদ্র হয়েছে শম্ভুর দাম্পত্য জীবনে। ধস নামছে। বেনো জল ঢুকছে ধীরে ধীরে। ফাটল বাড়ছে। সেই ফাটলের অন্ধকারে সুখের সন্ধানে ডুব দিচ্ছে শম্ভুর বউ যমুনা। সুখের পাখিটা সর্বক্ষণ গুন-গুনিয়ে গান গায়।

কী গান গায় ?

ভালবাসার গান গায়।

মাঝ রাতে জোয়ার।

সন্ধ্যার পর ফেটি জাল কাঁধে শম্ভু গেল 'গোনে' পাততে। অন্য কাজ না থাকলে এটাই শম্ভুর জীবিকা। নিরাশ করে না মা গঙ্গা। জোয়ারের স্রোতে, ঘোলাজলের সঙ্গে গুঁড়ো 'গোঁয়ো' মাছ ছিটকে আসে 'গোনে'। তা হাটে বিক্রি করলে নুন-তেলের পয়সা হয়ে যায়।

রাতে জোয়ার থাকলে, রাতের মধ্যে ফেরা হয় না শম্ভুর। ভাটা দেখে তবেই ফেরে। জোয়ারে যেমন কুঁচো মাছ জালে পড়ে। ভাটাতেও পড়ে। স্বভাবতই রাতে ফেরে না শম্ভু। তাতে সুবিধাও হয়। মাছ বাজারে বিক্রি করে সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করে ফেরে। এক পথ দুবার ভাঙতে হয় না। গতর বাঁচে। পয়সাও বাঁচে।

মাছ ভাল পড়ছিল। অমাবস্যার কোটাল। জলে টান ছিল। জোয়ারে ভাসা কাঠের গুঁড়িতে লেগে 'ডাং' ভাঙলো ফেটি জালের। হায় হায় করলো শম্ভু। রাতটাই মাটি হলো। দোরাস লোকসানের খাতায় গেল দিনটা। 'ডাং' পরিবর্তন না করলে জাল অকেজো নিরুপায় হয়ে মাঝ রাতে জাল কাঁধে ঘরে ফিরলো শম্ভু।

—বউ দোর খোল।

বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিল শম্ভু।

ঘরের মধ্যে কিসের যেন ব্যস্ততা। ফিসফিসানি।

শম্ভু পুনরায় বন্ধ দরজায় ঘা দিল। যমুনা নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমকাতুরে মেয়েমানুষ। নক্ষীছাড়ি।

—বউ দোর খোল।

বার বার ডেকে দরজা খুলছে না দেখে শম্ভুর মাথা গরম হতে শুরু করলো। রাত গউনে ইয়ার্কি! কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা যায়!

—ওরে খান্‌কী দোর খোল না। কতক্ষণ বাইরে দাঁইড়ে থাকবো।

দরজা খোলে না। সব সুনসান। ঘরের মধ্যে যমুনা আছে কি বোঝা যাচ্ছে না।

গালাগাল আর দরজা ধাক্কাধাক্কির শব্দে পাশের ঘর থেকে শম্ভুর মা

কুপি জ্বেলে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো।

চোখে দেখতে পায় না ব'টে কান খুব সতর্ক।

—ও বউ দোর খোল। শম্ভু ফিরিছে। খানিক নীরবতা।

—কানের মাতা খেইছিস না গাঙধারে গিছিস র‍্যা মাগী।

দরজা খুলছে না দেখে বুড়ির মুখ খুললো। হোস পাইপের মত হুড় হুড় করে বের হতে শুরু করলো অশ্লীল শব্দের মিছিল। আহা কি বাহার সে শব্দের। কত রকম গিটকিরি। বর্ণনা বিশেষণ। মরা মানুষও লাফিয়ে উঠবে তা শুনলে!

রাত গহনে মায়ে ব্যাটার চিৎকার চেঁচামেচিতে পড়শিরা এসে হাজির হলো শম্ভুর বাকুলে। তারাও বিস্মিত। মধ্যরাতে এ কেমন নাটক। নানান জনের নানান মন্তব্য। অনেক মানুষের অনেক প্রশ্ন।

বউ কেন দরজা খুলছে না? কি হয়েছে? শম্ভু এতক্ষণ ছিল কোথায়?

কে একজন মন্তব্য করলো—বউ লেশ্চয় বিষ খেয়েছে। আর একজন বললো—না। বোধয় গলায় দড়ি দিয়েছে। রাতের ব্যালায় বিষ পাবে কুথায়? মরেছে, লেশ্চয় মরেছে। মরবেনে, মায়ে ব্যাটায় কম জ্বালাতো বউটাকে। সে তো মানুষ। কত সহ্য করবে। মরেছে হাড় জুড়িয়েছে। নেহাত ভাল মানুষের ঝি তাই এমন ভাতারের ঘর করছে এতদিন। অন্য কেউ হলে মুয়ে মুতে দিয়ে চলে যেতুক।

অন্ধকারে কেউ একজন ফুট কাটলো।

—দ্যাখ ঘরের মধ্যে অন্য কেউ আছে কিনা।

অনেক মানুষের অনেক মন্তব্যের মাঝে বয়স্ক মানুষ কার্ত্তিক বললো—

—দোর ভেঙে দেখা উচিত। একটা কিছু হয়েছে নেশ্চয়।

উৎসাহী অনেকে সায় দিল কার্ত্তিকের কথায়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ দোর ভেঙে দ্যাখা হোক।

বাদল দোকানদার মানুষ। পাঁচরকম মানুষের সাথে তার মেলা—মেশা। কাজ কারবার। কাজে হঠকারিতা করে না। সে বললো—

—না খুড়ো। দোর ভাঙলে অনেক হাঙ্গামা। বলা যায় না কি হয়েছে ঘরের ভেতর। তার থেকে পুলুশে খবর দেওয়া ভাল। পুলুশ এসে দোর ভাঙুক। তাদের হ্যাপা তারা সামলাক।

উৎসাহী মানুষের অভাব হয় না কোনদিকই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ পুলুশে খবর দেওয়া হোক।

পুলিশের কথামাত্রেই অকস্মাৎ ঘড়াৎ করে আগড়ের দরজা খুলে কে যেন লাফিয়ে পড়লো উঠোনে।

দৌড়ালো অন্ধকারে।

—কে ? কে ? অনেক মানুষের চিৎকার।

—ধর ধর। চোর পালালো। চোর পালালো। চোর। চোর। কয়েকজন যুবক ছুটলো পলাতক মানুষটাকে ধরতে।

—চোর ! কার্ত্তিক বললো—চোর কী করে হয় ! শম্ভের ঘরে এমন কি আছে যে চোর ঢুকবে ? তাছাড়া দোর তো ভেতর থেকে বন্ধ ছ্যাল।

—সত্যি তো ! তাহলে ? তাহলে ?

অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো মানুষগুলোর সামনে। কী হতে পারে ? কে হতে পারে ? শম্ভের ঘরে চোর কেন ? কী উদ্দেশ্য ছিল চোরের ? চুরি না অন্য কিছু ?

মায়ের হাত থেকে জ্বলন্ত কুপি নিয়ে শম্ভু ঘরে ঢুকে দেখলো এক কোণে দেওয়ালে পিঠ ঠেসে দাঁড়িয়ে আছে যমুনা। বিবর্ণ মুখ। সামনে গিয়ে দাঁড়ালো শম্ভু।

যমুনার মুখের কাছে কুপি ধরে জানতে চাইলো।

—কে ঘরে ঢুকেছ্যাল ?

যমুনা নিরুত্তর।

—কে ঘরে ঢুকেছ্যাল ? জোরের সঙ্গে জানতে চাইলো শম্ভু।

ইতিমধ্যে কিছু কৌতূহলী মুখ খোলা দরজায় উঁকি দিচ্ছে। মধ্যরাতের নাটক দারুণ জমেছে। নতুন তামাশা দেখার কৌতূহলে তাদের চোখ উজ্জ্বল। নিরামিষ তামাশা নয়। আমিষের গন্ধে ভরপুর। মুখরোচক।

টক ঝাল মিষ্টি। গন্ধ বেশি ছড়াচ্ছে।

—কে ঘরে ঢুকেছ্যাল ? পুনরায় প্রশ্ন শম্ভুর।

যমুনা নিরুত্তর। অবনত মস্তক। ফাঁদে পড়া হরিণীর দৃষ্টি।

ইত্যবসরে পলাতক মানুষটাকে ধরে আনলো অনুসরণকারীরা। পালাবার সময় বোধ হয় ডোবায় পড়ে গিয়েছিল। পোশাক ভিজে। কানে চোখে মুখে গুঁড়ো পানা লেপটে আছে।

নরেন দেশলাই জ্বেলে ধরলো তার মুখের কাছে।

—এ যে শালা ভদ্দর নোক রে। বিল্লাপুরের বাবু!

—কে ? যতে ?

কুপি হাতে উঠোনে নামলো শম্ভু। দেখলো যতীনকে।

—স্যাঙাৎ তুই ?

—খেপ মারছিল। অন্ধকার থেকে মন্তব্য করলো কেউ।

শম্ভু বিস্মিত। যতে রাতের বেলায় যমুনার কাছে! আজ বুধবার। ওর থাকার কথা বিল্লাপুরে!

—মার শালাকে। চিৎকার করলো অনেকে। ধরে আনার সময়ই কয়েক ঘা দিয়েছে ছেলেরা। কপালে রক্ত গড়াচ্ছে। পুনরায় শুরু হলো ধোলাই।

শম্ভু কুপি হাতে পুনরায় গিয়ে দাঁড়ালো যমুনার সামনে।

যমুনা তখনো পূর্ববৎ। কাঠপুতুলের মত নিশ্চল।

কুপি মাচার ওপর রেখে যমুনার চুলের মুঠি চেপে ধরলো শম্ভু। টেনে আনলো দাওয়ায়। পাছায় লাথি মেরে ফেললো উঠোনে। উঠোন ভর্তি গ্রামের কৌতূহলী মানুষ। তাদের সামনেই কিল চড় লাথি ঘুষি বর্ষণ শুরু হলো যমুনার ওপর।

—খান্‌কী, বেশ্যা। রাতের ব্যালায় ঘরে নোক ঢুইকেছিস। এটা কি তিন ফটকের খান্‌কীপাড়া। হারামজাদা মাগী। তোকে আজ মেরে ফেলবো।

ঘটনা দেখতে পাচ্ছে না শম্ভুর মা। কিন্তু শুনতে পাচ্ছে। হেঁকে বললো—

—মার মার মাগীকে মেরে ফ্যাল। শেষ করে দে। পুঁতে রাখ। হাড় থেঁতো করে দে! জ্বাইলে দে।

যমুনা মাথা নিচু করে নীরবে শম্ভুর সব আঘাত সহ্য করলো। একবারও মাথা তুলে দেখলো না। প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করলো না। মাটিতে ফেলে বুকে পিঠে লাথির পর লাথি চালিয়ে যাচ্ছে শম্ভু। ক্রোধের শেষ বিন্দুটুকুও উজাড় করে দেবে।

বিষাক্ত কালসাপিনী নিয়ে ঘর করা যায়। কিন্তু চরিত্রহীন স্ত্রী নিয়ে ঘর করা যায় না।

পাগল হয়ে গেছে শম্ভু। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যমুনাকে পেটাচ্ছে।

সব জিনিসের সীমা আছে। সহ্যেরও নিশ্চয় সীমা আছে। প্রথম প্রথম সহ্য করলেও এক সময় কালসাপিনীর মত ফুঁসে উঠলো যমুনা। রুখে দাঁড়ালো। বারুদে আগুন লাগার মত দপ করে জ্বলে উঠলো।

বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভে বিস্ফোরণ ঘটলো। দু'হাতে শম্ভুকে ঠেলে উঠে দাঁড়ালো সে। ডাইনির মত ভয়ঙ্কর তখন দৃষ্টি। বিস্রস্ত পোশাক। বিশৃঙ্খল চুল।

—বেশ করিচি ঘরে নোক ঢুইকিছি। আবার ঢোকাবো। তোর নজ্জা করে না নিমুরুদে মিন্‌সে। খেতে দিতে পারিসনি। পরতে দিতে পারিসনি। ভাতারি ফলাতে আসিস কোন আক্কেলে।

—তবে রে মাগী—।

শম্ভু ছুটে গেল যমুনার চুল ধরতে। প্রস্তুত ছিল যমুনা। সপাট ধাক্কায় উঠোনে ছিটকে ফেললো শম্ভুকে। উঠোন ভর্তি নারী-পুরুষের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো—

—মেয়েরা ভাতার ঘর করে শুধু পেটে খেতে? ওই মুখপোড়া মিন্‌সে পেরেছে আমাকে সুখ দিতে।

পুনরায় রুখে উঠলো শম্ভু।

—এই মাগী চুপ করবি।

—কেন চুপ করবো। একশো বার বলবো তুই হিঁজড়ে। নিমুরুদে। তোর ঘর আমি করবুনি। বাজারে নাঙ করে খাবো।

শম্ভুর মত যমুনাও কি পাগল হয়ে গেল! যেকথা নারীর মুখে উচ্চারিত হওয়া নিন্দনীয় সেকথা অবলীলায় বলছে। তবে কি আজ শেষ বোঝাপড়ার জন্যে প্রস্তুত! সমাজের কাছে কি কৈফিয়ৎ চাইছে! নিজেকে উন্মুক্ত করে সমাজের অন্ধকারের কদর্য রূপটা সবার সামনে প্রকাশ করছে!

—আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ। এসব কী হচ্ছে। উঠোন ভর্ত্তি নোকজন। দু'জনার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কার্ত্তিক।

—শম্ভে ঘরে যা। বউ তুইও ঘরে যা। কেচ্ছা বাড়াসনি।

উপস্থিত মানুষদের উদ্দেশ্যে বললো—

—তোমরা সব ঘরে যাও গো। ওদের মাগ ভাতারের ব্যাপার। ওরা মিটিয়ে নেবে।

সবাই তামাশা দেখছিল। সুযোগ বুঝে চম্পট দিয়েছে যতীন। যখন খেয়াল হলো, ভদ্দর নোক তখন হাওয়া।

শম্ভু আর যমুনাকে বুঝিয়ে শান্ত করে, শম্ভুর মাকে বুঝিয়ে ভোর রাতে ঘরে ফিরলো কার্ত্তিক। শম্ভু আপাতত শান্ত হলেও কার্ত্তিককে শুনিয়ে রাখলো—কালকেই যাবো পঞ্চায়েতে। দুশ্চরিত্রা বউ নিয়ে ঘর করবুনি। ইস্তফা দোব।

তা আর করতে হলো না শম্ভুকে। সে রাতেই ঘর ছাড়লো যমুনা। সোজা গিয়ে উঠলো যতীনের বিরলাপুরের বাসায়।

॥ ১২ ॥

গাছ-গাছালির মাথা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে সূর্য। ঘুম ঘুম লাল চোখে দেখছে পৃথিবীকে। অন্ধকারের সাগরে ডুব দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নদীর বাঁধ ধরে হেঁটে আসছে একজন। কে ওই আগন্তুক ?

সন্ধ্যার অবসরে জেলে পাড়ার অনেকেই এসে বসে বাদলের চা দোকানে। অলস সময় কাটে দুঃখ সুখের গল্প করে। চা খাওয়া। হাসি মস্করা পরচর্চা সবই হয়। ঝগড়া কাজিয়াও হয়। এটাই গ্রামের প্রাণ কেন্দ্র। বিভিন্ন স্থান থেকে বিচিত্র সংবাদ এসে জমায়েত হয় এখানে। অন্য মানুষের মুখ হয়ে সে সংবাদ ছড়িয়ে যায় বিভিন্ন গ্রামে। বাৎসরিক বারোয়ারী মেলা বসে গাজন তলায়। যাত্রা হয়। সে যাত্রার মহড়া চলে বাদলের দোকানে। কেউ কেউ তাই মন্তব্য করে বাদলের দোকানটা না থাকলে গেরাম কানা হয়ে যেতুক।

আগন্তুক ছোকরা দর্শনে শহুরে শহুরে ভাব। প্যাণ্ট শার্ট পরা। কাঁধে কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ। এরকম ছোকরা দেখলেই ভয় হয়। বুকের মধ্যে টিপটিপ করে অনেকের। এই চেহারার মানুষগুলো ভাল নয়। ভীতিকর। কয়েক বছর পূর্বের একটা স্মৃতি তাদের ভাবায়। বছর আষ্টেক পূর্বে হারু কয়ালের শালীর ছেলে এসে কয়েকদিন ছিল হারুর বাড়িতে। ছেলেটা যে বিপজ্জনক কে জানতো। দিব্যি শহুরে ভদ্দর নোক। সুন্দর সুন্দর কথা বলে। হঠাৎ একদিন রাতে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল তাকে। শুধু তাকে নয় হারুকেও ধরেছিল পুলিশে। অনেক নাটা ঝামটা দিয়েছে। হাজতে থাকতে হয়েছিল একমাস। মামলা চলেছিল কয়েক বছর। হারুর দুবিঘা ধানের জমি বিক্রি করতে হয়েছিল মামলা চালাতে। সেই থেকে হারু নাকে কানে খৎ দিয়ে বলেছে—

—যে যত বড় আত্মীয় হোক রাতে বাড়িতে থাকতে দুবুনি হে। কুটুম এসেছো খাও চলে যাও। ব্যস তুমি আমার পর নও।

ছোকরা এসে দাঁড়ালো বাদলের দোকানের সামনে। হাবভাবে মনে হচ্ছে সে গ্রামের সব জানে চেনে। দোকানের সামনে নদীর বাঁধঘেঁষে বাখারির বেঞ্চে বসেছিল জগন্নাথ দাস।

—ঠাকুরদা আমাকে চিনতে পারো?

বয়েস হয়েছে জগন্নাথ দাসের, চোখে কম দেখে। ছানি জমেছে। ঘোলাটে চক্ষু মেলে দেখার চেষ্টা করলো।

—তোকে তো চিনতে পারলুমনি বাপ।

দোকানের ভেতর থেকে তখন বেরিয়ে এসেছে অনেক মানুষ। হাবুল চিনতে পারলো আগন্তুককে।

—তুই শিরিষ নয়? বিস্ময় ঝরে পড়লো হাবুলের চোখে।

—হ্যাঁ। চিনতে পারলি তাহলে!

—এতদিন ছিলিস কোথা?

—অনেক জায়গায়।

—কী করিস এখন?.

—কোলকাতায় কলে কাজ করি। চটকলে। পাট থেকে সেখানে চট থলে বস্তা হয়।

সবজান্তার মত নবীন বললো—সেই বিল্লাপুরের চটকলের প্যানা? পেল্লায় চিমনে। হুস্‌হুস্ করে কালো ধোঁয়া বাই হয়। সকালে সন্ধ্যে ভোঁ বাজে?

নিজের চোখে দেখা চটকলের বর্ণনা দিল নবীন।

—তুই তেবু কোলকতায় গিছলি বলে বেঁচে গেলি। আমরা এখেনে এক্কিবারে মরে গেলুম। ভগবান তোদের ভাল করুক। একশো বছর পরমাই দিক।

নিজের কপালে হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলো জগন্নাথ।

শিরিষ এই গ্রামেরই ছেলে। তার বাপ নিতাই 'শুকোয়' গিয়ে ফিরে আসেনি। সঙ্গীরা বলেছে কুমীরে নিয়েছে।

অসহায় বিধবা নাবালক ছেলের হাত ধরে কয়েকদিন কাজ কামের আশায় ঘুরেছিল। না পেয়ে গ্রাম ছেড়েছিল।

অনেক বছর পরে আজ গ্রামে ফিরলো শিরিষ। এখন সে বালক নয়। যুবক, চওড়া ছাতি। মোটা গোঁফ।

—তোর মা কেমন আছে? বাদল জানতে চাইলো।

—মা গত বছর সগ্‌গ পেয়েছে।

শিরিষ কত বদলে গেছে! গ্রামের ছেলে কারখানার শ্রমিক হয়ে অভিজ্ঞতায় দড় হয়েছে। অভিজ্ঞতার ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে বাঁচতে গেলে লড়তে হবে।

মানুষ মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়। অনেক প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করে মৃত্যুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হয় মানুষকে। মৃত্যুই লড়াইয়ের সমাপ্তি।

এই গ্রামের ছেলে হলেও শিরিষ আজ অন্য পৃথিবীর। গ্রামের মানুষদের দেখে সে বিস্মিত। এরা কত অল্পে সন্তুষ্ট। অত্যাচারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে মালিক মহাজনের ঘর ভরে দিচ্ছে সম্পদে। প্রতিবাদ নেই, প্রতিরোধ নেই, ক্রোধ নেই, ঘৃণা নেই। ধীরে ধীরে ক্লীব হয়ে যাচ্ছে। ভবিতব্য বলে মেনে নিচ্ছে অত্যাচারকে। অবিচারকে মেনে নিচ্ছে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলে।

শিরিষ অনেক গল্প শোনালো। অন্যরকম কাহিনী, কেউ বুঝলো। কেউ বুঝলো না। কিন্তু কথাগুলো ভাগ লাগলো। শহরে গিয়ে অনেক শিখেছে। জেনেছে। বাঁচার কথা কার না ভাল লাগে!

গ্রামে কয়েকদিন থেকে শিরিষ উপলব্ধি করলো কয়েকপুরুষ শোষণ অত্যাচারে এদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়েছে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মনোবল নেই। বুকের মধ্যে ক্ষোভ আছে, প্রতিবাদের ভাষা নেই। ঘৃণা আছে, প্রকাশের

কৌশল জানা নেই। চারযুগের ক্ষোভ জমতে জমতে এদের বুকের ভেতর বারুদের পাহাড় জমে উঠেছে। ওই বারুদে স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ পেলে দারুণ বিস্ফোরণ ঘটবে। তছনছ করে দেবে পুরাতনকে। চুরমার করে দেবে পুরানো ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস।

দিন চারেক থেকে শহরে ফিরে গেল শিরিষ। কিন্তু গ্রামের মানুষগুলোর যন্ত্রণাকে উসকে দিয়ে গেল। ছাইচাপা ছিল যে আগুন হঠাৎ তা গনগনে রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। বন্ধ চোখের ওপর থেকে সরে গেল কালো পর্দা। স্পষ্ট হয়ে উঠলো বাস্তব পৃথিবী। নতুন দৃশ্য।

ডাকাবুকো কয়েকজন গোপনে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল। পরে কি হবে সে পরের কথা। এখন শুরু হোক।

একদিন সকালে বিষ্টুপুরের মানুষরা দেখলো শাদা কাগজে লাল রঙ দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে কি যেন লিখে লটকে দিয়েছে গাছে গাছে। সবাই দেখলো। এতে কী নিকেছেরে? ভোট কি এসে গেল? ভোটের সময় এমনি নানা রঙের কাগজ গাছে গাছে ঝুলিয়ে দেয়। আর দেয় কাছাকাছি কোথাও যাত্রাগান হলে।

—কী নিকেছেরে?

যারা পড়তে পারে পড়লো। যারা পড়তে পারে না অন্যকে জিজ্ঞাসা করে জানলো।

বড় বড় হরফে আঁকাবাঁকা টানে কয়েকটি মাত্র কথা।

'চারভাগের তিনভাগ না দিলে কেউ মহাজনের জালে যাবো না।'

চারভাগের তিনভাগ! সবাই অবাক হলো।

গুঞ্জন উঠলো জেলে পাড়ায়।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এ কান থেকে ও কান। এ মুখ ও মুখ হতে হতে সমস্ত জেলে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়লো। তারপর গোটা বিষ্টুপুর গ্রাম। ঘরে আগুন লাগার মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম। দূর থেকে আরো দূরে।

অনেকের বিস্ময়। এ কেমন ধারা কথা! এরকম হয় কখনো?

অনেকে বললো — হক কথা নিকেছে বাবু।

অনেক মানুষের অনেক মন্তব্য।

একিবারে মনের কথা টেনে নিকেছে গো।

মৈনুদ্দিন বললো — ঠিক নিকেছে। মোরা খেটে মরবো, আর মজা নুটবে মহাজন। সবটাই সে নেবে। এ কেমন ধারা নিয়ম। নিয়ম অদল বদল না হলে মোদের বাল বাচ্ছা বাঁচবে কি করে। মোরা বাঁচবো কি করে।

সংগ্রাম, লড়াইয়ের কথা নয়। এ বাঁচার কথা। পুরুষানুক্রমে উপলব্ধির কথা।

বেশি তোলপাড় হলো বাদলের চা দোকানে। কে লিখেছে কে জানে, কিন্তু জেলেদের মনের কথা টেনে লিখেছে। দিন দিন দেশের হাল যা হচ্ছে পুরানো নিয়মে আর চলবে না। আইন পাল্টাতে হবে। নিয়ম বদলাতে হবে। পরিবর্তন করতে হবে চিরায়ত রীতিনীতি।

সবাই একমত। যা লিখেছে ঠিক লিখেছে।

বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ চমকালো। ইলিশমারাদের বুকের মাঝে যে ক্রোধ লুকিয়েছিল এতকাল, তা চঞ্চল হয়ে উঠলো। এরকম দাবির প্রয়োজন ছিল। দাবি আদায়ের জন্যে লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে। দাবি আদায় না হলে দেশে গাঁয়ে বাঁচা যাবে না। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করছে ইলিশমারারা।

সবাই বললো — হক কথা। চারভাগের তিন ভাগ চাই।

দু'একজন অবশ্য নীরব থাকলো। তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কি করবে। দাবি, লড়াই মানেই তো হাঙ্গামা হুজ্জুৎ।

মহাজন ছাড়বে কেন। গ্রামে পুলুশ আসবে। ধরে নিয়ে যাবে থানায়। হাজত হবে। জেল হবে।

যেমন হয়েছিল অনেকদিন আগে।

গ্রামের শান্ত বাতাসে কয়েকদিন ঝড় তুললো। তারপর ধীরে ধীরে

থিতিয়ে এলো ঝড়ের দাপট। কয়েকজন গভীরভাবে লক্ষ্য করছিল পোস্টারের প্রতিক্রিয়া। কার্ত্তিক নবীন হাবুল শ্রীকান্ত মৈনুদ্দিন সুধীর কালীপদ আরো অনেকে বসে শলা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল শিরিষের কথামত জাল বন্ধ করা হোক।

—আমরা কেউ জালে যাবুনি। মরশুমে যদি গাঙে জাল না পড়ে তাইলে হাজার হাজার ট্যাকা নোকশান মহাজনের। রাজি শালাকে হতেই হবে।

অনেক আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত হলো—জাল বন্ধ। এক কথা, ন্যায্য ভাগ দাও। কাজ বুঝে নাও। এখন সেইদিন—ফেল কড়ি মাখো তেল তুমি আমার পর নয় গো।

ইতিমধ্যে একটা উড়ো সংবাদ ভেসে এলো বিষ্টুপুরের বাতাসে। পদ্মপুকুর, হাঁসখালি, এনাৎনগরের জেলেরা জাল বন্ধ করেছে দুসপ্তা আগেই। মহাজনের জাল গাঙে নামছে না।

বিষ্টুপুরের মাছমারাদের বুকের গভীরে পাহাড়ি ধসের গুরু গুরু শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

মাতাল রক্তে নেশা ধরছে।

শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত চলকাচ্ছে।

কাজ বন্ধ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ কাজ বন্ধ। অনেক কণ্ঠের স্বীকৃতি।

কালী আনন্দে হাততালি দিল।

—বেড়ে মজা হবে কিন্তুক। শালা খগেনকে, বিষ্টুকে এসতে হবে আমাদের কাছে। হাতজোড় করে বলতে হবে—বাবা বোনাইরা তোমরা জালে না গেলে আমি মরে যাবো। আমার মাগ ছেলে মরবে।

—তুই থামতো কালী। এখুন ইয়ার্কির সময় নয়। ধমক দিল কার্ত্তিক।

কাজ বন্ধে অনেকেই সায় দিচ্ছে। কার্ত্তিকও অরাজি নয়। কিন্তু তার ভাবনায় আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব চলছে। এই অসম লড়াইয়ে কতটা সফল

হওয়া যাবে—সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। এখন শিরিষ থাকলে ভাল হতো। বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারতো।

লড়াই ছেলে খেলা নয়। আজ যারা লড়াই লড়াই করছে এরা যদি শেষ পর্যন্ত পিছু হটে। তখন? যদি শেষদিন পর্যন্ত লড়াইকে টেনে নিয়ে যাওয়া না যায়।

হাবুলকে দোকানের বাইরে ডেকে কার্ত্তিক বললো—

—জালে না হয় না গেলুম। কিন্তুন আমাদের চলবে কী করে?

বুক ফুলিয়ে হাবুল বললো—তিন ভাগ দিলেই কাজ করবো।

—মহাজন যদি না দেয়?

—আমরাও কাজ করবুনি।

—একদিন, দু'দিন, তিনদিন, একসপ্তা। তারপর? এতগুলো জেলে পরিবারের পেট চলবে কি করে?

জীবন যুদ্ধে পোড় খাওয়া মানুষ কার্ত্তিক। জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছে পৃথিবীতে। পৃথিবীর পায়ে চলা বন্ধুর পথে হাঁটছে বহু দিন। অনেক সমস্যা দেখেছে। সমস্যার মোকাবিলা করেছে। অনেক উত্থান পতনের পরিবর্তনের প্রত্যক্ষদর্শী সে।

কার্ত্তিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না হাবুল। অসহায় বোধ করছে। সত্যি তো লড়াইয়ের উল্টো দিকটা একবারও ভেবে দেখেনি। কাজ বন্ধ হলে এতগুলো মানুষের মুখে হাত উঠবে কেমন করে।

দোকানের কোণে বসে বিড়ি টানছিল কালীপদ। এখন সে পূর্বের মত বাউণ্ডুলে নয়। রাধা তাকে আমূল শুধরে নিয়েছে।

পুরোদস্তুর সংসারী মানুষ এখন। কৈশোরে স্বপ্ন দেখেছিল বড় হলে বোষ্টম হবে। আখড়া খুলবে। নিরু বোষ্টমীর মত একজন কেউ থাকবে সেখানে। সন্ধ্যায় সাধন ভজন করবে। গানের আসর বসবে। না। তা হয়নি। রাধা ঘরে এসেছে। কিন্তু আখড়া খোলেনি। সাধারণ নারীর মত সংসারী হয়েছে। চাঁদনী রাতে মনটা হয়তো উদাস হয় অতীত স্মৃতি রোমন্থনে। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর রাতের রক্তাক্ত স্মৃতি আখড়া খুলতে বাধা

দিয়েছে। কালীকেও সে ইচ্ছার পথ থেকে সরিয়ে এনেছে। বলেছে—

—এই ভাল। তুমি জালে যাও। হাটে যাও। আমি ঘরে থাকি।

নিজের যেমন পরিবর্তন হচ্ছে তেমনি আমূল পরিবর্তন করেছে কালীকে।

কালী এখন অন্য মানুষ।

কার্ত্তিকের কথায় সায় দিল।

—খুড়ো ঠিক কথা বলেছে। মহাজনকে জব্দ করতে কাজ বন্ধ করলে আমাদের পেট যে কাঁদবে।

কার্ত্তিক অবাক। একটু আগেই সে কাজ বন্ধের কথায় উল্লাস প্রকাশ করছিল। এখন বলছে বিপরীত কথা।

—উপোস আমাদের পেরানের বন্ধু গো। কাজ বন্ধ করলে মহাজনের আর কি? মরবো আমরাই। মাগ ছেলে না খেয়ে মরবে। আমার কথা হচ্ছে আমাদের জাল নৈকো করতে হবে। সব্বাইয়ের জাল নৈকো চাই। কারো গোলামি করবুনি।

কালীর বক্তৃতার ঢঙে হাসলো সবাই। কার্ত্তিক হাসলো না। তার এখন মনে হচ্ছে কালী অনেক কথার মধ্যে একটা ভাল কথা বলেছে। নিজেদের জাল নৈকো থাকলে মহাজন কাজ বন্ধ রেখে জব্দ করতে পারবেনে। উল্টে নিজেই জব্দ হয়ে যাবে।

—ঠিক কথা বলেছে কালী। নিজেদের জাল নৈকো করতে হবে। তবেই মহাজনকে টাইট দেওয়া যাবে। চাপে পড়লে তবেই শালা বাপ বলবে। কিন্তুন এখন আমরা নিধিরাম সর্দার। মহাজনের জালে যাবুনি। এতগুলো মানুষের পেট পোঁদ চলবে কেমন করে? হাওয়া ফুঁকে? তোমরা ভেবে ছ্যাখো। হয় জাল নৈকো করতে হবে। না হয় মহাজনের সঙ্গে কাজিয়া না করে জালে যেতে হবে।

সত্যিতো লড়াই হবে কিসের ওপর দাঁড়িয়ে। শূন্য উদরে নিদ্রা আসে না লড়াই কথাটা সেখানে অবাস্তব।

—জাল নৈকো করতে অনেক ট্যাকা চাই। কে দেবে ট্যাকা?

কাত্তিকের কথার পিঠে মৈনুদ্দিন বললো—ঠিক কথা। এমনি প্যাটে ভাত জোটে না। ঝি বউয়ের পোঁদের ট্যানা উড়ে যাচ্ছে। আমরা করবো নড়াই। জাল নৈকো অনেক ট্যাকার ব্যাপার। ও সব রাজা মহারাজারা পারে। অমন গাড়োয়ানী ভাবনা না ভাবাই মঙ্গল। এই তো বিডি বাবু আমাদের কাঁচকলা চোষালো।

মৈনুদ্দিনের কণ্ঠে হতাশা।

—কারুর একার পক্ষে জাল নৈকো করা সম্ভব নয়।

অন্য প্রস্তাব রাখলো কালী!

—আমরা সব্বাই কিছু কিছু চাঁদা দিয়ে পেরথম চার পাঁচটা জালের সুতো কিনি। সবাই বুনলে ক' দিন লাগবে। চারটে নৈকো ভাড়া নিতে পারি। চারটে জাল এখুন গাঙে নামুক। কিছু মাছ পড়বে। আমাদের এক ব্যালা এক সন্ধে চলুক। ততদিনে মহাজন জব্দ।

নিজের কথায় হেসে উঠলো কালী। বক্তৃতার ঢঙে কথা বলে ভাবলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভারী ভারী কথা বলতে পেরেছে ভোটবাবুদের মত।

মৈনুদ্দিন কালীকে উদ্দেশ্য করে বললো—তুইতো অনেক কথা বললি রে কালী। তুই বলতো রাজবংশী পাড়ায় এমন ক'জন মনিষ্যি আছে যে চাঁদা দিয়ে জাল করবে? ভাতের অভাবে ঘরের বউ ঝি যাচ্ছে বিল্লাপুরে বাবুর বাড়িতে ঝি গিরি করতে। ইজ্জৎ বিলোচ্ছে পেটের দায়ে। পেরথম তুই বল কত ট্যাকা চাঁদা দিতে পারবি?

আলোচনার শ্রোতারা উৎসাহিত হচ্ছিল। মৈনুদ্দিনের কথায় হোঁচট খেল তাদের উৎসাহ। সত্যি কথা। ক'জন মানুষ আছে জেলে পাড়ায় চাঁদা দিতে পারবে। পারে মহাজনরা। তাদের অনেক আছে। যা হবার নয় তা হবে কেমন করে। ছোট ছোট মানুষদের বড় বড় চিন্তা মানায় না। ভগবান যাদের মেরে রেখেছে কেউ পারবে না তাদের বাঁচাতে।

দোকানের অন্ধকার কোণে বসে ঝিমুচ্ছিল সুধীর। বললো—আমি কি একটা কথা বলতে পারি?

সভাপতির কাছে অনুমতি নেবার ভঙ্গিতে বললো।

সমস্যার অথৈ জলে পড়ে সবাই যখন হাবুডুবু খাচ্ছে, পরিত্রাণের পথ পাচ্ছে না। তখন সুধীরের কথা গুরুত্ব পেল না সভায়। সে যেন ফালতু, আলোচনায় অংশ গ্রহণে অযোগ্য।

নবীন ধমকে উঠলো — থাম, তুই আবার কি বলবি রে গ্যাঁজাড়ে।

গ্রামে গুরুত্ব পায় না সুধীর। তার বদ দোষ — প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক-টান গাঁজা না হলে চলে না। আজো গাঁজা টেনে ঝিম মেরে বসে আছে। আলোচনা শুনছে কি বোঝা যাচ্ছিল না।

কেউ কেউ অবশ্য আপৎকালে সুধীরের কথায় অন্ধকারে জোনাকির আলো দেখলো। বলা যায় না কখন কার দ্বারায় কি উপকার হয়। হয়তো ওই একবিন্দু জোনাকি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জ্বালিয়ে দিতে পারে।

মৈনুদ্দিন বললো — বলুক বলুক। ওকে বলতে দাও। কি বলতে চায় শোনা হোক।

— বল বল। এবার অনেকে উৎসাহ দিল সুধীরকে।

কেশে গলা পরিষ্কার করে সে তাকালো উপস্থিত মানুষগুলোর দিকে। কেরোসিনের আলোয় আবছা ওদের মুখগুলো। অনেকগুলো চোখ ভৌতিক চোখের মত নিরীক্ষণ করছে তাকে। সে যে নেহাত ফালতু নয় এবার মনে হলো। পাঁচজনে তার কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। শুনছে।

— আমার শ্বশুরের তিনটে জাল আছে। দু'টো নৈকো আছে। গত সনে শ্বশুর পটল তুলেছে। আমার ইস্তিরি ওদের একটাই মেয়ে। জাল নৈকো সব আমার পাপ্য। তাই কিনা ? কিন্তু শাউড়ি বড় দজ্জাল মেয়ে মানুষ। এখুন বলছে জামাইকে দুবুনি। বিক্রি করে দোব। আমি একটা মাত্তর জামাই। আমাকে গেরাজ্যি করেনে। তোমরা যদি আমার শাউড়িকে বুঝিয়ে বলতে পারো তাইলে ওই জাল নৈকো ধার দিতে পারি।

উপস্থিত সবাই বিস্মিত। দোকানদার বাদলও। গ্যাঁজাড়ে সুধীর বলছে কি ! আনন্দের আতিশয্যে হাততালি দিল নবীন। সমস্যার আশু

সমাধানের এমন উপায় আর কী হতে পারে? কালীপদ আবেগে উচ্ছ্বাসে বুকে জড়িয়ে ধরে চটাস করে একটা চুমু খেল সুধীরের দাড়ির জঙ্গলে।

মৈনুদ্দিন বললো — সুধীর দেবেনে তো দেবে কে? কেমন লোকের ব্যাটা দেখতে হবে তো। বাপের ব্যাটা।

সবাই যখন উল্লাস করছে, সুধীর তখন আম্‌শি মুখে দেখছে সবাইকে। কি যেন বলতে চায়। বলতে পারছে না সঙ্কোচে।

— কীরে সুধীর কিছু বলবি?

— মানে — কথাটা হলো গে···আমতা আমতা করছে সুধীর। বউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে দু'সপ্তা।

— কেন? কেন? কী হয়েছ্যাল?

অনেকগুলো প্রশ্ন ঝাঁপিয়ে পড়লো হুড়মুড়িয়ে। এমন একটা রসালো সংবাদ দু'সপ্তা গোপন ছিল কি করে? আশ্চর্য। এখানে বাতাসও কথা বলে। সামান্য ঘটনা। একবিন্দু ফিসফাস মুহূর্তে বিশাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এমন বউ পালানোর মুখরোচক সংবাদ কেউ জানতে পারেনি! এ যে অবিশ্বাস্য।

— বড় বজ্জাৎ মেয়ে মানুষ। পরপুরুষের দিকে নজর। জোয়ান মদ্দ দেখলেই ছোঁক ছোঁক করবে। দিয়েছিলুম তাই ধুম্‌সে।

— এখন তাইলে কী হবে? জানতে চাইলো কার্ত্তিক।

— তোমরা গেরামের ষোলো আনা একটা মিটমাট করে দও। খুব শিক্ষে হয়েছে আমার। আর কক্ষনো বউকে কিছু বলবুনি। বউ গুরু-জন···

সুধীরের কথায় হেসে উঠলো কেউ কেউ। কেউ হাসলো বলার ভঙ্গিতে। কেউ হাসলো তার করুণ অবস্থা বিবেচনা করে।

চায়ের গ্লাসে চামচ নাড়তে নাড়তে আলোচনার সবই শুনছিল বাদল। মাঝে মধ্যে হুঁ হাঁ দিয়ে সমর্থন করছিল। খদ্দেরও সামলাচ্ছিল। বাদল

চিরকালই একটু চাপা। কথা বলে কম। যা বলে ভেবে চিন্তে বলে।

—আমি একটা কথা বলবো ?

সবাই দেখলো বাদলকে।

—বলো বলো। তুমি তো আমাদেরই একজন।

—চাঁদার টাকাতেই হোক, অথবা সুধীরের শ্বশুরের হোক। জাল নৌকা হচ্ছে। কিন্তু জালে যা ইলিশ পড়বে তাতে তোমাদের সংসার চলবে তো ? গাঙের এই হাল। আগে ইলিশ পড়তো পঞ্চাশ ষাট একশো অবধি। এখন ? আট দশ। চারটেও পর্যন্ত। তোমরা ভেবে ছ্যাখো।

নতুন সমস্যা। সত্যি তো। তিনটে জালে কত ইলিশ পড়বে ? একটা নৌকার ভাড়া দিতে হবে। এতগুলো পরিবারের দৈনন্দিন খরচ কত ? কালী প্রস্তাব দিয়েছিল অর্ধেক মাছের টাকায় সংসার চলুক। অর্ধেক টাকায় নতুন জাল হোক।

শম্ভু এতক্ষণ শুনছিল। সে বললো—বড় বড় পেলান আমাদের মাথায় চলবেনে। তাইলে জজ ব্যালেষ্টর হাকিম মুন্ত্রীরা না খেয়ে মরবে। তারা নেকা পড়া শিখে সব ঘাস কাটছে। আমরা বড় বড় পেলান করছি। হুঁ। ছাড়তো ওসব ভাবনা। শম্ভুর কণ্ঠে বিরক্তি। অসন্তোষ।

হরি মোড়ল বললো—

—যেমুন চলছ্যাল চলতে দিলি হতুক। বড় নোকের সঙ্গি নাগলে আমরা গরীব গুবরো মনিষ্যিরা পারবো কেন ? শ্যাষে আমরাই মরবো।

ধমকে উঠলো হাবুল।

—তুমি থামতো খুড়ো। না খেয়ে মরার চেয়ে নড়াই করে মরা ভাল। আমরা নড়াই করতে চাই।

—অনেক নড়াই দেখলুম রে হেব্‌লো। তিনকুড়ি পার হত্তি চললো। বড় নোকের সঙ্গি নড়াই করে গরীবরা কবে কোথায় জিতেছে ? সব হেরে ভূত হয়েছে। মরেছে। বড় নোকের একটা চুলও সোজা করতে পারেনে। তোরা ছেলে ছোগরা। গায়ের অক্ত গরম। নড়াই নড়াই করছিস, নড়াই তো দেখিসনি। ওরা বড় নোক। অনেক পয়সা ওদের।

থানা পুলুশ গরমেন ওদের ঘরের নোক। ওদের কথা সব্বাই শুনবে তোদের কথা কে শুনবে রে? নড়াই করতে গেলে মরবি। মাগ ছেলেবে ভাসাবি। যেমন চলছ্যাল চলুক। নড়াই বাধলে পেটের অন্ন জুটবেনি ওরা আছে বলে আমরা খেতে পাচ্ছি। ওরা না থাকলে কে কাজ দিত কার নৈকোয় কাজ করতিস? হাওয়া ফুঁকে থাকতিস? যে অন্ন দেয় সে অন্ন দাতা। বাপের সমান। বাপের সঙ্গি নড়াই করবি? ভগমান তোদের···

হরি মোড়লের কথা শুনে সবাই হতবাক। এ কার কণ্ঠস্বর! হরি মোড়লকে এইভাবে গুছিয়ে কথা বলতে কেউ শোনেনি কোনদিন।

—তোমরাই তো ওদের মাথায় তুলেছো।

পুনরায় ধমকালো হাবুল।

—চিরকাল বাবু বাবু করে পায়ে তেল দিয়েছো। নিজেরা মরেছো আমাদেরও মেরেছো। ওরে আমার 'এরে'। নড়াই করলে মরবো। আর নড়াই না করে খুব সুখে আছি কিনা। অনেক রাত হলো। তুমি এখন বাড়ি যাও দিকিনি খুড়ো। খুড়িমা ভাবছে।

হাবুলের কথার ওপর কথা বললো না হরি মোড়ল। হ্যারিকেন হাতে ঝুলিয়ে বাড়ির পথ ধরলো। মনে মনে বললো—

এখনকার ছেলে ছোগরারা সব উল্টো। তিরিক্ষে মেজাজ। বাপ বললে শালা বলে।

কালী বললো—শালা বুড়ো হয়ে ভাম হয়েছে। বুড়ো শুগ্নি বিষ্টু দাসের চাম্চা। পা চাটা কুত্তা।

বিষ্টু দাসের জাল নৌকা দাদন নিয়ে মাছ ধরে হরি। নৌকার কাজ না থাকলে বিষ্টুর বাগানে মুনিষের কাজ করে। দিন চলে মোটামুটি। জেলে পাড়ার আর সবার থেকে হরির অবস্থা একটু ভাল। দু'বেলা পেটে ভাত পড়ে। বউ ঝিদের পরনে বস্ত্র আছে। একটা নাতি স্কুলে যায়।

তিন তিনটে দিন চলে গেল আলাপ আলোচনায়। সমাধান সূত্র মিললো না। লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে। মহাজনের অনিস্থুক হাত থেকে কিছুটা ছিনিয়ে না আনতে পারলে মরতে হবে। সামনে দু'টো পথ। এক—মহাজনকে চার ভাগের তিন ভাগ দিতে বাধ্য করা। দু'ই—জাল নৌকা করে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো। এ সময় শিরিষের মত একজন পরামর্শদাতার প্রয়োজন। যে অন্ধকারে আলো দেখাতে পারবে। সঠিক পথ বাতলাতে পারবে।

কার্ত্তিক প্রথম থেকেই ভাবছে কেমন করে সবাইকে বাঁচিয়ে রেখে লড়াইটা বাধানো যায়। যে ভাবেই হোক লড়াইটা বাধাতে হবে। এবং তাতে জিততে হবে। না হলে জীবন যেমন চলছিল তেমনি চলবে। এত আশা আকাঙ্ক্ষা সব ব্যর্থ হবে।

বাদল বললো—বি. ডি. ও. সাহেবের কাছে একবার গেলে কেমন হতো। শুনছি বি.ডি.ও. সাহায্য টাহায্য করছে।

—দুর। ওখানে গিয়ে কিচ্ছু হবেনে। সব শালা কাগের বাচ্ছা। শুধু কা কা করছে। মগডালে বসে হল্লা করছে। দেখলুম তো বিডিবাবুর কেরামতি। ও সব বড় নোকের জন্যে।

মৈনুদ্দিনের কথার উত্তরে বাদল বললো—

—আগের বি.ডি.ও. এখন নেই। বদলি হয়েছে। নতুন যে এয়েছে শুনছি ভাল মানুষ।

বাদলের কথা ধরে কার্ত্তিকও বললো—আমিও সেদিন হাটে শুনছিলুম নতুন বি.ডি.ও. নাকি ভাল মানুষ।

আরো দু'একজনও বি.ডি.ও. সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলো।

—আরে একবার নাড়া দিলে গাছের সব ফল পড়ে? বার বার নাড়া দিয়ে ত্যাখ।

বেশির ভাগ মানুষ নিমরাজি। সরকারি দপ্তরের প্রতি তাদের অনীহা। অবিশ্বাস। আসলে সরল এই মানুষগুলো চিরকাল সরকারি দপ্তরে হেনেস্তা হয়েছে বিনা কারণে। হয়রান হয়েছে প্রতি পদে পদে।

বিশ্বাসের ভিতটাই দুর্বল এই জন্যে।

—সেই ভাল। আগে দেখি গরমেন আমাদের জন্যে কি ভাবছে। চল কালই বি.ডি.ও. আফিসে যাই।

কার্ত্তিকের কথায় কোন প্রতিক্রিয়া হলো না অন্যদের মধ্যে। বাদল বললো—দশ পনেরো জন গেলেই চলবে।

পরের দিন সন্ধ্যার পূর্বেই বি.ডি.ও. অফিস থেকে ফিরলো কার্ত্তিক ও তার সঙ্গীরা। ফলাফল প্রকাশ করলো না বাদলের দোকানে। বাদল আর মৈনুদ্দিনকে বাইরে ডেকে নিয়ে শোনালো।

—সব্বাই এই ভাবে চলতে রাজি হবে তো?

কার্ত্তিকের মনের কথা বলে ফেললো মৈনুদ্দিন।

—না হলে করার কিছু নি। যারা রাজি হবে তাদের নিয়েই শুরু হোক। হরি মোড়ল আসবেনে। আরো কিছু মানুষ নাও আসতে পারে। কিন্তু আমাদের বসে থাকলে চলবেনে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে হবে। বোঝালে বুঝবে লেশ্চয়।

কার্ত্তিক আত্মবিশ্বাসী।

কাজ বন্ধ!

কোটালের মুখোমুখি হঠাৎ থেমে গেল জেলেপাড়ার ব্যস্ততা। মহাজনের জাল যেমন ভারায় শুকোচ্ছিল তেমনি থাকলো। নৌকাগুলো নোঙ্গর গেঁথে পড়ে থাকলো গাঙের চড়ায়। নৌকা জলে ভাসলো না। জাল জলে ডুবলো না।

অবাক হলো মহাজনরা। জাল বন্ধের হাওয়া হরি মোড়লের মুখ ভায়া হয়ে একটু একটু কানে গিয়েছিল। বিশ্বাস করেনি। জালে না গেলে হাভাতেদের পেট চলবে কি করে। খগেনের সন্দেহ এসব ভূতো রায়ের উস্কানি। নাহলে ওরা এত সাহস ধরে কি করে। চারভাগের তিন ভাগ চাই? ইয়ার্কি নাকি? চারভাগের তিন ভাগ দিলে আমাদের

থাকবে কী ? কাঁচকলা ? মাগ ছেলে নিয়ে আঙুল চুষবো ? জাল নৌকার খরচ নেই ? ওসব খাতির চলবেনে। নিয়ম নিয়ম। এতকাল চলেছে এখনো চলবে। শালা ছোটলোকের ডানা গজিয়েছে মরার জন্যে।

মুখে গর্জালেও ভেতরে ভেতরে আতঙ্কিত হলো খগেন। ভূতো রায় যদি ওদের পেছনে থাকে তাহলে জল অনেকদূর গড়াবে। মরশুমের মুখে জাল নৌকা বসে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত।

কাজ বন্ধ। সন্ধ্যায় গুলতানি বাদলের দোকানে। অন্যদিন থেকে আজ উপস্থিতির হার বেশি। সবাই কৌতূহলী। কী হয়। কী হয়। লড়াই তো শুরু হলো। পরবর্তী ভাবনা চিন্তা কি। মহাজনের প্রতিক্রিয়াই বা কেমন।

অশ্বিনী এলো হ্যারিকেন হাতে।

—কার্ত্তিক কোথায় ?

—কে ? দোকানের ভেতরে থেকে বললো কার্ত্তিক।

—তুই একবার বাইরে আয়। কার্ত্তিক এলো।

বাবু তোকে ডেকেছে।

—বাবু ? কোন বাবুরে ? বিস্মিত হবার ভান করলো কার্ত্তিক।

তেরিয়ে উঠলো অশ্বিনী।

—ন্যাকামি করছিস শালা। কাল সকালেই যাবি। জরুরি দরকার।

—কেন রে ? আমার জন্যে বরাসন পেতেছে নাকি তোর বাবু ?

অশ্বিনী উত্তর না দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে গেল। শব্দ করে হাসলো কার্ত্তিক। একদিনেই ওষুধ লেগেছে। যাবে কোথায় শালা মানিক চাঁদ ? এর নাম রামঠ্যালা।

সকালেই হাবুল শ্রীকান্ত নবীনকে নিয়ে খগেনের বাড়িতে গেল কার্ত্তিক। সহাস্যে আপ্যায়ন করলো খগেন। বসতে বললো। তারপর যা কোনদিন করে না তাই করলো। তামাক সেজে কার্ত্তিকের দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

—নেরে কাত্তিক। গরীবের বাড়িতে এলি একটু তামাক খা। নেশার ব্যাপারে খগেন প্রাচীনপন্থী। সিগারেটের যুগে তামাক খায়। বাইরে বের হলে বিড়ি। তার নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণা আছে। বিড়ি ভাল। সিগারেট হাল্কা। নেশার আসল মজা তামাকে। এতে মান আছে, আছে বনেদীয়ানা। কাত্তিক কে ইতস্তত করতে দেখে বললো—

—নে নে লজ্জার কি? তোরা হলি আমার আপন লোক। বলতে গেলে ঘরের মানুষ। বিপদের বন্ধু।

খগেন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার পূর্বেই কাত্তিক বললো

—সে আর বলতে, আমরা জানিনি। গত মরশুমে ছিকান্তকে নৈকো দেবে বলে দাওনি। এ বছরও তাই। কি বলবো কত্তা পিরিতের বন্ধু না হলে এমন ব্যাভার করবে কেন?

থাপ্পড় খাওয়া বাচালের মত থমকে গেল খগেন। পুরানো অস্ত্রটা যে এমন ভাবে প্রয়োগ করবে কাত্তিক বুদ্ধিতে আসেনি। বুদ্ধিমান মানুষ। হাসিমুখে সামলে নিল।

—ও সব পুরানো কথা ছেড়ে দে। আসলে কি জানিস এসব আর আমার ভাল লাগে না। সংসার বড় বিষ। সব ছেড়ে ছুড়ে তীথে চলে যাবো।

ধুতির খুঁটে চোখ মুছলো খগেন।

কার্ত্তিক নবীন শ্রীকান্ত হাবুল তাকালো পরস্পর।

মুল্লুকে এত ভদ্দর নোক হলো কবে থেকে? বকধার্মিক। কিছু জানে না। শালা ছুঁচো।

—তোরা হলি পিতিবেশী। একটু সুখ-দুঃখের গল্প…

বিরক্ত হলো কার্ত্তিক। আসল কথায় না এসে মাগীদের মত প্যান প্যান করছে। শালা উল্লুক।

—আমাদের ডেকেছিলে কত্তা?

—এঁ্যা। হ্যাঁ হ্যাঁ। তোরা আমার নিজের লোক। আমার কিছু হলে তোরাই তো দেখবি। হলেও তোরা, মোলেও তোরা। নাকি বল?

তোর বউ ছেলেমেয়ে কেমন আছে রে কার্ত্তিক ?

—ভাল। সব ভাল। আপনি কেমন আছো ?

—ওই আছি আর কি। বয়স তো হলো। কোনরকমে বেঁচে বত্তে আছি তোদের দয়ায়। মা লক্ষ্মী বিমুখ। শূন্য ঘরে আমি একা। আমার মরণ ভাল। আর বাঁচবুনি রে কার্ত্তিক। হঠাৎ শুনবি আমি মরে গিছি।

পুনরায় মুখ চাওয়াচায়ি করলো ওরা। শালা পাঁয়তাড়া কষছে। বড় কিছু একটা বলবে, অস্ত্র শানাচ্ছে।

খগেনের বিশেষত্ব। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার পূর্বে একটু ভূমিকা করে তারপর আসল কথায় আসবে।

পায়ে ঘা শালা বলে বাঁচবুনি। শালা শয়তানের বাচ্ছা। শব্দ না করে গালাগাল দিল শ্রীকান্ত।

খানিক নীরব থেকে আসল কথায় এলো খগেন।

—তোরা হঠাৎ জাল বন্ধ করলি কেন ভাই ?

নীরব সবাই। এ রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে জানতো। মনের মধ্যে কথাগুলো সাজিয়ে কার্ত্তিক বললো—

—আজ্ঞে কত্তা, হঠাৎ নয়। আপনাকে আগে জানিয়েছিলুম। আমরা যা ভাগে পাই ওতে মাগ ছেলের পেট ভরে না। গরীব মানুষ তো, পেটের খাঁইটা বড্ড বেশি। কত আর শুইকে থাকি বলো। অনেকবার বলিছি। কান দেবার সময় হয়নি আপনার। তিন ভাগ দিলে তবে আমরা কাজ করবো।

—না দিলে ?

—কাজ হবে না।

—এ্যাঁ বলিস কিরে! বিস্ময়ের ভান করলো খগেন।

চারভাগের তিন ভাগ দিলে আমাদের চলবে কি করে। আমরা মরে যাবো। জাল নৌকার দাম কত জানিস। একটা জালের দাম চার হাজার টাকা।

মাথা হেলিয়ে কার্ত্তিক জানালো—জানে। ভাল রকম জানে। এত

কাল কবিরাজী করছে মকরধ্বজ চেনে না। ভালই জানে কত ধানে কত চাল হয়।

—তোরা আমাকে মারবি।

—না কত্তা। আপনি কেন মরবে। মরতে হলে আমরা মরবো। আমাদের মাগ ছেলে মরবে।

ওদের মুখগুলো ভাল করে নিরীক্ষণ করে খগেন বললো—

—যা বলি শোন। ও সব বদ মতলব ছাড়। ওতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। যেমন চলছিল চলুক। তোরাও বাঁচ। আমিও বাঁচি।

—না কত্তা। আমাদের ওই এক কথা।

—তোরা কি কারখানার মত হরতাল করবি?

—ওই হলো আর কি। যদি তাই বলেন তাই।

—ও।

নীরবতা। খগেন কিছু ভাবছে। কার্ত্তিক ও তার সঙ্গীরাও ভাবছে। অবাক হচ্ছে আজ কার্ত্তিকের কথাবার্তা শুনে। বেশ গুছিয়ে কথা বলছে নেতার মত।

খগেনের নীরবতা প্রতি আক্রমণের প্রস্তুতি। অস্ত্রে শান দিচ্ছে। এরা ভাবছে আক্রমণটা কোনদিক দিয়ে আসতে পারে।

—তোরা তো পাঁচজন। আর সবাই যদি গাঙে নামে?

—নাববেনে। প্রত্যয়ের স্বর কার্ত্তিকের কণ্ঠে।

—তাই বুঝি। খগেন হাসলো শয়তানির হাসি।

কাল রাতে গোকুল মোহন কালো অমৃত আমার কাছে এসেছিল। ওরা বলে গেছে জাল বন্ধ করবেনে।

কার্ত্তিক বিস্মিত। তা কেমন করে হবে! কাল রাতে ওরাও বাদলের দোকানে ছিল। সবাই মিলে ঠিক হয়েছে জাল বন্ধ হবে। শালা ধড়িবাজ মিথ্যা বলছে। ভড়কি দিচ্ছে। তাছাড়া আজকে সবাই বন্ধের সামিল হয়েছে।

—গাঙে জাল নাবালে টুঁটি কেটে জলে ভাসিয়ে দোব।

জোরের সঙ্গে বললো কার্ত্তিক।

—এ্যাঁ খুন করবি ?

—দরকার হলে করতে হবে। হাবুল বললো।

সিরিয়াস হলো খগেন। এরা তৈরি হয়েই এসেছে।

—আমি যদি তোদের শর্তে রাজি না হই ?

—তোমার জাল নৈকো গাঙে নাবৰেনে।

সাফ উত্তর কার্ত্তিকের।

—কাজ করবি নি খাবি কী ?

—জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

—বলিস কিরে ? তোর মুখে নতুন কথা শুনছি। তা বেশ। তোরা যখন ঠিক করেছিস তখন বন্ধই থাক। কতটা জল মেপে ছ্যাখ। আমিও গাঙে জাল নাবাবুনি। ওতে তো লাভ থাকে না। জাল নৌকা রাখা হাতি রাখার সমান। নেহাত তিন পুরুষের পেশা তাই চালিয়ে রেখে-ছিলুম। যাক গে ভালই হলো। তোরা যখন গাঙে নাববিনি। হাকিম-গঞ্জের কেষ্ট জাল নৌকা কিনতে চাইছিল। তবে বিক্রি করে দিই।

—আমরা তাইলে আসি কত্তা।

উঠে দাঁড়ালো কার্ত্তিক। অযথা সময় নষ্ট।

—আচ্ছা আয়।

খগেনের বৈঠকখানা থেকে পথে নামলো ওরা। পেছন থেকে খগেন চেঁচিয়ে বললো—

—গাছে তোলার লোক অনেক আছে নাবাবার লোক পাবিনি বুঝলি কার্ত্তিক। ও শালা ভূতো রায় অনেককে ডুবিয়েছে। পরের কথায় নাচিসনি। মরবি।

খগেন ভূতনাথকে প্রতিপক্ষ ভাবছে। তার ধারণা ভূতো ওদের নাচাচ্ছে। ভূতোই এদের পরামর্শদাতা। খগেনের কথার উত্তর দিল না কার্ত্তিক। একটু দূরে এসে শ্রীকান্ত বললো—

—শালা ভাম। গাঙে জাল নাবাবুনি। দোজপক্ষের মাগের পোঁদে

পাছাপেড়ে শাড়ি আসবে কোত্থেকে ?

ধমক দিল কার্ত্তিক।

—থাম। এখুন ভেবে ছ্যাখ। যদি ওরা জাল গাঙে না নাবিয়ে তুলে রাখে তখন আমরা কি করবো ? কার সঙ্গে নড়াই করবো ? কে দেবে আমাদের তিন ভাগ ?

ভাববার কথা।

সন্ধ্যায় বাদলের দোকানে কার্ত্তিক সবাইকে শোনালো।

—আজ মুল্লুকে কে সাফ বলে এয়েছি চারভাগের তিনভাগ দণ্ড জাল নৈকো গাঙে নাববে। শালা খুব খচে গেছে।

মৈনুদ্দিন বললো—ঠিক বলছিস। শেষ পর্যন্ত খগেন কী বললো ?

—বললো গাঙে জাল নাবাবুনি। জাল নৈকো রাখা নোকসান। তিন পুরুষের ব্যওসা তাই করি। বললো হাবুল।

—ওরে আমার 'এরে' গাঙে জাল নাবাবুনি। কি খাবে ? খাবি ? দেখাই যাক নড়াই শুরু হোক। তারপর দেখা যাবে কাঁহাকা পানী কাঁহা যায়।

কালীর কথার পিঠে মৈনুদ্দিন বললো—

—ভাববার কথা। ঠিক আছে, নড়াই যখুন শুরু হয়েছে তখুন শেষ তক তো নড়তে হবে।

গোকুল মোহনকে দেখে কার্ত্তিক বললো—

—তোরা নাকি গাঙে নাববি বলিছিস ?

সরাসরি প্রশ্ন।

কাজ কাম বন্ধ। অখণ্ড অবসর। খানিকটা দেশী মাল চাপিয়ে মেজাজে ছিল মোহন।

—কোন শালা বলেছে এ কথা ?

—আজ সকালে খগেন বলেছে।

—এ্যাঁ, চল দেখি শালার ব্যাটাকে এক্ষুনি জ্যান্ত পুতে ফেলবো।

—থাক, এখন বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই। সময় আছে তখন দেখবো

তুমি কত বড় বীর পুরুষ।

বিনিদ্র রাত্রি সাঁতরাচ্ছে কার্ত্তিক! মহাজনরা যদি জাল না নামায় হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই হবে? মহাজনের ক্ষতি কতটুকু? উদরান্নের জন্য তাকে তো ভাবতে হয় না।

ইলিশমারাদের একমাত্র ভরসা মহজনের জাল নৌকা। লড়াই কথাটা শুনতে ভাল। কিন্তু লড়াই যদি না হয়? প্রতিপক্ষ যদি ময়দানে না নামে লড়াই হবে কার সাথে? লড়াই শুরু না হলে জেতার প্রশ্ন কোথায়? বি. ডি. ও. সাহেব অনেক আইনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সময় মত সরকারি সুবিধাগুলো যদি না পাওয়া যায়। তাহলে? তাহলে অবনতমস্তকে মহাজনের কাছে গিয়ে বলতে হবে — বাবু কাজ দ্যান।

কার্ত্তিকের মত সবাই বিনিদ্র রাত্রি শেষ করলো। সকাল হলো। লড়াইয়ের তালিকায় দিনের আর একটা সংখ্যা বৃদ্ধি হলো। শূন্য নদী-বক্ষ। নৌকাহীন নদীবক্ষে শিশু ঢেউগুলো নির্বিঘ্নে চল্‌কে চল্‌কে আনন্দ প্রকাশ করছে। শুশুকরা মহা আনন্দে লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে। হাসছে নাচছে। দিচ্ছে ডুবসাঁতার। লুকোচুরি। হুল্লোড়ে তোলপাড় করছে নদীর ঘোলাজল।

কর্মহীন দিন বড় ক্লান্তিদায়ক। কাটতে চায় না সময়। কেউ গেল হাটে। কেউ কুটুমবাড়ি। কেউ মেরামত করলো ঘরবাড়ি!

শ্রীকান্ত ঘরের কানাচে মাটি খসে যাওয়া জায়গাটা নতুন মাটি ধরিয়ে সমান করলো। কালী আর রাধা বাঁশ কঞ্চি নারকেল পাতা দিয়ে তৈরি করলো ছোট রান্নাঘর। কার্ত্তিক আর মৈনুদ্দিন দু'জনে দু'টো ছাকনি জাল মেরামত করলো বাদলের দোকানের বেঞ্চে বসে। মোহন মাল খেয়ে সমস্ত দিন পড়ে থাকলো পদ্মর উঠোনে। তার বউ দু'বার এসেছিল নিয়ে যেতে। পারেনি। শম্ভু অবশ্য খানিকটা কাজ গুছিয়েছে। শিঁক-বাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল পুঁটে মাঝির ঘোলের দিকে। গোটা দশেক বড় সমুদ্রে কাঁকড়া ধরে বাজারে বিক্রি করেছে বারো টাকায়। গোকুল গিয়েছিল

ভূতো রায়ের চালকলে। ম্যানেজার বলেছে এখন কাজ মন্দা। পরে আসিস।

চারদিন পরেই জেলে পাড়ার অনেকেরই হাঁড়িতে টান ধরলো। অন্যকিছু সঞ্চয় নেই। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের আর কত চলবে। এবার ? এবার কী হবে ?

—কী গো কার্ত্তিক খুড়ো। আর চলে না যে। ওসব 'কেন্' ছেড়ে চলো যাই মহাজনের কাজে।

অনেক মানুষ, অনেক প্রশ্ন। কার্ত্তিক যেন নেতা। তার জন্যেই গ্রামের মানুষের এত দুর্গতি। জেলে পাড়ার সবাই তার কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করছে।

আচ্ছা ঝকমারি। কেউ কেউ পেছনে কটূ মন্তব্যও করছে। কেষ্ট আর মদন সবার সামনেই বললো—

—আর দু'টো দিন দেখবো। যদি কিছু না হয় মহাজনের কাজে যাবো।

—এখন কী করি বলতো চাচা !

মৈনুদ্দিনের কাছে পরামর্শ চাইলো কার্ত্তিক।

—এরা তো আমাকে চোর সাজাবে। মদনের বউ আমার বাড়িতে চাল চাইতে এয়েছ্যাল।

—ভাববার কথা। প্যাটে ক্ষিদে থাকলে নড়াই হয় না। এককাজ কর। সুধীরের সাথে ওর শ্বশুর বাড়ি চল। জাল নৈকো আনি। গাঙে পড়ুক। কিছু তো হবে। যারা খুব 'কারে' পড়েছে তাদের কিছু দেওয়া হোক। এখনকার মত বাঁচুক। মুখ রক্ষে হোক। বেলাক বাবু কী বলেছে ?

—কাল যেতে বলেছে।

—ভাল হয়েছে। ক'জন যাক সুধীরের সঙ্গি। ক'জন যাক বেলাক অফিসে। দুদিকেই কাজ চলুক। হেস্ত নেস্ত একটা হবেই।

মৈনুদ্দিন আশাবাদী। সম্মানজনক ফয়সালার আশা করছে।

কার্ত্তিক কিন্তু হতাশ। নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে। চ্যাঙড়া ফচ্‌কে শিরিষের কথায় না নাচাই উচিত ছিল। ও সব নড়াই-টড়াই কোলকেতা শহরে হতে পারে। এখানে হয় না। হবেও না। যারা প্রথম দিকে বেশি উৎসাহী ছিল তারাই ভেঙে পড়ছে। পড়বেই তো। ছেলে মেয়ে বউকে উপোসে রেখে কেমন করে চলবে লড়াই। কিন্তু ফেরার পথ নেই কার্ত্তিকের। আগাতে হবে।

জেলে পাড়ার মানুষ দ্বিধা বিভক্ত। একপক্ষ লড়াই চালাবার পক্ষে। এরা অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বয়স চল্লিশের মধ্যে। অন্য পক্ষে বয়স্করা। মহাজনের কাজে যাবার পক্ষে।

সুধীর লড়াইয়ের পক্ষে। বেশি উৎসাহী। তেড়েল মাতাল গাঁজাড়ে হোক মহাজনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম সারিতে। কার্ত্তিক কে হতাশ হতে দেখে সে পুনরায় শ্বশুর বাড়ি যাবার প্রস্তাব দিল। আশা দিল যতদিন না বিশেষ ব্যবস্থা হয় ততদিন জাল নৌকা গ্রামের ষোলো আনার থাকবে।

আঁধারে একটুখানি আলোর নিশানা।

পাঁচ ক্রোশ পথ ঠেঙিয়ে দুপুর বেলায় কার্ত্তিক মৈনুদ্দিন সুধীর আর হাবুল গেল সুধীরের শ্বশুর বাড়িতে। কিন্তু সুবিধা হলো না। বড় কঠিন ঠাঁই। জামাইকে গ্রাহ্যই করলো না সুধীরের শাশুড়ি। সবাই মিলে বোঝালো মা মেয়েকে।

পতি পরম দেবতা। পতি সেবাই নারীর ধর্ম। এজন্মের কর্মের ফলে আগামী জন্মে সুখী জীবন ইত্যাদি। অনেক ভুজুং। অনেক জলপড়া। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। গোঁ ধরে বসে থাকলো সুধীরের বউ। তার এক কথা।

— অমন মাতাল মিন্‌সের ঘর করবুনি।

শেষে ক্ষমা চাইতে হলো সুধীরকে। প্রতিশ্রুতি দিতে হলো ভবিষ্যতে এমন করবে না। তবে মান ভাঙলো দেবীর, স্বামীর ঘরে ফিরতে

রাজি হলো। কিন্তু বেঁকে বসে থাকলো তার মা। অনেক বাহানা বুড়ির।

—জামাই কেন মেয়ের ওপর অত্যেচার করে? মেয়ে আমার পথে পড়েছ্যাল? ও মুখপোড়া কি ভেবেছে? ওর বাড়িতে না গেলে মেয়ের অন্ন জুটবেনে? মদ গিলে মাগের ওপর বিক্কম ফলাতে আসে এমন জামাই পেয়জন নি। আমি জানবো মেয়ে আমার আইবুড়ো। তোমরা ভদ্দর নোকরা এয়েছো খেয়ে দেয়ে চলে যাও।

সুধীরের শাশুড়ি বাজারে মাছের ব্যবসা করে। কাঁচা মাছের ব্যবসা ছাড়াও শুট্‌কি মাছের ব্যবসাও বেশ জমজমাট। হাতে পয়সা আছে। দেমাকের দিকটা ওজনে ভারি। কথায় টান। নাকের নথ নেড়ে পুনরায় বললো—মাছ বেচে মায়ে ঝিয়ের চলে যাবে। অমন ভাতারের ঘর করবেনে আমার মেয়ে। দরকার হলে আবার মেয়ের বে দোব।

সুধীর শুনলো। অনুভব করলো মায় ঝিয়ের তাপ। অকপট চিত্তে স্বীকার করলো অপরাধ। অভিযোগের প্রতিবাদ করলো না। উল্টে বিনয়ের সাথে স্বীকার করলো ঘটনার দিন বেশি নেশা হয়েছিল। প্রতিজ্ঞা করলো আর ওরকম ঘটবে না। ভাল মানুষ হয়ে যাবে। মদ ছোঁবে না কোনদিন।

মৈনুদ্দিন মুরুব্বি মানুষ। বোঝালো সুধীরের শাশুড়িকে।

—তুমি আর ক'দিন আছো মা ঠাকরুণ, স্বামী বদমাশ হোক মাতাল হোক তাকে শোধরাবার দায় তো মেয়েদেরই। মেয়েরা নক্ষী। সংসারের হাল ধরে চালাবে।

বয়স্ক মানুষের কথায় কঠিন বরফ নরম হলো। ভেবে দেখলো মুখে যতই গরম দেখাক মেয়েরা শেষে স্বামীর ঘর ছাড়া যাবার জায়গা আছে? নাড়ার গোড়ার জল বেড়ার গোড়াতেই যাবে। বেশি চাপাচাপি করলে মচকে যাবার সম্ভাবনা। রাজি হলো বুড়ি। বলা যায় না এ যুগের ছেলে, ছুম করে আর একটা বিয়ে করে বসতে পারে। মেয়ে পাঠাতে মত দিল। তবে শর্ত থাকলো মেয়ের গায়ে হাত তুলতে পারবে না জামাই।

দু'টো নৌকা তিনটে জালসহ ওরা সন্ধ্যার পূর্বেই ভিড়লো বিষ্টুপুরের ঘাটে।

চোখ চকচকিয়ে উঠলো ইলিশমারাদের।

পরের দিন হাকিমগঞ্জের নুরুদ্দিন মিঞার একটা নৌকা ভাড়া করে আনলো কার্ত্তিক।

রাতের জোয়ারে তিনটে জাল পড়লো গাঙে।

পূর্ণিমার কোটাল। লড়াইয়ের পঞ্চম দিন। আকাশে মেঘের চাঁদোয়া। জল থৈ থৈ গাঙ। উথাল পাতাল বুক। শেষ ভাদ্রের ছিঁচ-কাঁদুনে বৃষ্টি।

থেকে থেকে ইল্‌শেগুঁড়ির সাঁই সাঁই হল্‌কা। ঠাণ্ডা ভিজে বাতাস। তিন মহাজনের সতেরোখানা জাল অনুপস্থিত। ইলিশের পথ পরিষ্কার। জোয়ারের ঘোলাজল প্রবল বিক্রমে ছুটে আসছে। হেই সামাল। হেই সামাল। বান আসছে।

অনেক আশা বুকের গহিনে বেঁধে নৌকায় বসে ভিজছে কয়েকজন মানুষ। প্রার্থনা করছে।

—মা গঙ্গা গো। বাবা বদর পীর গো। এ লড়াইয়ে যেন জিততে পারি।

রাতের অন্ধকারে ভাসা মানুষগুলোর মত নদীর পাড়ে অসংখ্য মানুষ দুশ্চিন্তায় রাত্রি সাঁতরাচ্ছে। আশা নিরাশার ঝটপটানি বুকের গহনে। বিষ্টুপুরের জেলে পাড়ার প্রতিটি ঘরে বিনিদ্র রাত্রির দমবন্ধ করা প্রতীক্ষার প্রতিযোগিতা।

অন্ধকার তরল হচ্ছে। পূব আকাশ ফিকে আলোয় চকচকিয়ে উঠছে। রাত্রিভর প্রতীক্ষার যবনিকা উঠছে। তিনটে জাল উঠে এলো নৌকায়।

—জয় মা গঙ্গা।

উল্লাসে চিৎকার করলো নৌকার মানুষরা।

—দরিয়ার পাঁচ পীর।

—বদর বদর।

ভোরের বাতাস চমকে উঠলো ইলিশমারাদের উল্লাসে। প্রথম ক্ষেপেই পেল্লায় ছত্রিশটা ইলিশ। আশাতীত। ইলিশমারাদের মুখে চলকে উঠলো হাসি।

জেলে পাড়ার দক্ষিণে গাঙের চড়ায়, আড়ম্বরে সিন্নি চড়ানো হলো বদর পীরের থানে। গঙ্গা মায়ের পূজো হলো। সবাই আনন্দ করলো। নাচলো। গাইলো। দাশুর তৈরি চোলাই টেনে মাতাল হলো।

শ্রীকান্ত, কালীপদ আর গোকুল গিয়েছিল ব্লক অফিসে। ফিরলো সন্ধ্যার পর।

—কী খবর ?

কার্তিকের প্রশ্নের উত্তরে কালী বললো—সব ঠিক হয়ে গেছে।

কাল বিকালে বেলাক বাবু আসবে।

শীতলা মায়ের থান। প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের নিচে সিমেন্টের বাঁধানো চত্বর। ভূতো রায়ের পূর্ব পুরুষেরা কেউ বাঁধিয়ে দিয়েছিল। আজো অক্ষত আছে। চল্লিশ পঞ্চাশ জন মানুষ সহজে বসতে পারে। এখানেই বসে গ্রামের ষোলো আনা।

বি. ডি. ও.'র জিপ এসে থামলো শীতলার থানে। নামলেন নতুন বি. ডি. ও.। বয়েসে যুবক। কয়েকমাস এসেছেন।

জমায়েত দেখে খুশি হলেন। সরাসরি আলোচনা শুরু করলেন মৎসজীবীদের সাথে। শুনলেন অতীতের কথা। বর্তমানের কথা। তিনি শোনালেন সরকারের কথা। নিয়ম নীতি, পদ্ধতির কথা। কেমন করে, কোন্ পথ ধরে আগালে সরকারি হাত সাহায্য করতে পারে।

অবাক হলো বিষ্টুপুরের মানুষ। নতুন বেলাকবাবু বলে কি ? এত চেষ্টা করে যা হয়নি আজ এত সহজে হয়ে যাবে !

বি. ডি. ও. বললেন—হবে। পূর্বে কি হয়েছে, কি হয়নি আমি জানি না। কিন্তু এখন হবে। এর জন্যে চাই আপনাদের সহযোগিতা।

উপস্থিত মানুষগুলোর মধ্যে থেকে ন'জনকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করলেন। সভাপতি, সম্পাদক নির্বাচিত করলেন। পরের দিন — বিষ্টুপুর মৎসজীবী সমবায় সমিতির বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হলো অশ্বত্থ গাছের ডালে। আপাতত এটাই সমবায়ের অফিস। খাতাপত্র থাকলো হাবুলের বাড়িতে। প্রতিদিন বি. ডি. ও. অফিস থেকে একজন কর্মী এসে সাহায্য করতে থাকলো সমবায়কে।

এত কাণ্ড কারখানা খগেন টের পেল অনেক পরে। ইতিমধ্যে বি. ডি. ও.'র আন্তরিক প্রচেষ্টায় সরকারি অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়ে গেল সমবায়। সমবায় গঠনের সংবাদ খগেন পেয়েছিল কিছুদিন আগে। গুরুত্ব দেয়নি তখন। মুখ্যু জেলেরা করবে সমবায়! বিশ্বাস করতে পারেনি। ফুঃ ফঃ যারা বাপের নাম জানতে চাইলে বোনাইয়ের নাম বলে তাদের সমবায় ওই গাছের ডাল পর্যন্ত। গরমেনের টাকা এত সস্তা নয় যে গাছের ডালে চোথা টাঙালেই দিয়ে দেবে। হাভাতেরা ব্যাঙের পাঁচ পা দেখেছে। আর ক'টা দিন জাল বন্ধ থাক শালাদের হাঁড়িতে মাকড়সার জাল পড়ুক। ভিজে কুত্তার মত কুঁই কুঁই করবে পায়ের কাছে।

ফল বিপরীত হলো। খগেন যখন বাস্তব উপলব্ধি করলো তখন হাতের তাস চলে গেছে অন্য হাতে। সমবায়ের পায়ের নিচে মাটি দিন দিন শক্ত হচ্ছে।

এছাড়া আরো চিন্তিত হলো যখন শুনলো ওরা কোথা থেকে জাল নৌকা জোগাড় করে সমবায় প্রথায় চালাচ্ছে। গাঙে জাল পড়ছে। মাছের টাকা ভাগ হচ্ছে।

অফিসে গিয়ে বি. ডি. ও.-কে বোঝাবার চেষ্টা করলো খগেন।

— ওই কপাটি চলবেনে স্যার। সব টাকা মাঠে মরে যাবে। ওই ছোট লোকরা আপনাকে টাকা ফেরত দেবে? সব খেয়ে ফেলবে। আগের বি. ডি. ও. অনেকবার ঋণ দিয়েছে, সব খেয়ে ফেলেছে। এক পয়সাও শোধ করেনি।

বি. ডি. ও. খগেনের কথায় হাসলেন।

—আপনার জাল নৌকা আছে ?

স্বভাবসিদ্ধ হেসে খগেন বললো—হেঁ হেঁ তা আছে।

—কতগুলো ?

—বেশি নয় হুজুর। আপনার বাপমায়ের আশীব্বাদে পনেরো খানা নৈকো আর……

—তাই বুঝি। এখন বন্ধ আছে ?

—হ্যাঁ। ওই ছোট লোকরা ইসট্রাইক করেছে।

—ঠিক আছে আপনি এখন আসুন। আপনার কথা ভেবে দেখবো।

বি. ডি. ও. বয়েসে যুবক হলেও ইতিপূর্বে কয়েক জায়গায় চাকরির অভিজ্ঞতা আছে। গ্রামের কায়েমী স্বার্থ আর বাস্তু ঘুঘুদের চিনতে দেরি হলো না। এরা শহরে গ্রামে সব স্থানেই আছে। পরিবেশ অনুযায়ী নাম চেহারা এবং পোশাকে পৃথক। চরিত্রে অভিন্ন। এদের কালো হাতের থাবা সর্বত্র প্রসারিত।

বিষ্টুপুর মৎসজীবী সমবায়ের অনুকূলে দ্রুত ঋণ মঞ্জুর হলো বি. ডি. ও. এবং স্থানীয় এম. এল. এ'র আন্তরিক চেষ্টায়। ঋণের টাকায় কেনা হলো সূতো। নিদ্রিত জেলে পাড়া হঠাৎ জেগে উঠলো প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে। 'কেঁড়ে' 'পাটি'তে ধূলো জমেছিল বহুদিন কাজ না থাকায়। জেলেদের হাতের দশটা আঙুল সচল হয়ে উঠলো নতুন উদ্যমে। প্রতিটি সক্ষম পুরুষ হাতে তুলে নিল 'টাকু' 'চরকা' 'ফেরাই' 'কেঁড়ে' 'পাটি'। জেলে পাড়া হয়ে উঠলো জাল তৈরির কারখানা।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সাতটা জাল তৈরি হলো। পাঁচটা পুরানো নৌকা কিনে মেরামত করে নেওয়া হলো হাকিমগঞ্জের নিয়ামত মিস্ত্রিকে এনে।

মহাজনের জাল নদীতে না থাকায় সুবিধা হলো সমবায়ের। অনেক

ইলিশ পড়তে থাকলো সমবায়ের জালে।

চকচকে ইলিশ।

রূপালী ইলিশ

মাছের রানী ইলিশ।

জলকন্যা সুন্দরী রূপসী ইলিশ।

ইলিশ তো নয় গলানো রূপো।

সাত সপ্তাহের মধ্যে আশাতীত অগ্রগতি হলো সমবায়ের। দেখে চমৎকৃত হলেন বি. ডি. ও.। এত দ্রুত কোন সমবায় স্বাবলম্বী হয়েছে তাঁর জানা নেই। এর কারণ অবশ্য অফুরন্ত উৎস আর অনুকূল বাজার। প্রচণ্ড চাহিদা। ইতিমধ্যে সরকারি-ঋণের প্রথম কিস্তি পরিশোধ হয়ে গেছে। ঋণ-পরিশোধেরও নজির গড়তে চলেছে বিষ্টপুর মৎসজীবী সমবায় সমিতি।

সব ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎ গণ্ডগোল বাধলো। সব গ্রামেই কিছু কুঁতুলে খোঁচড় সবজান্তা মানুষ থাকে। যারা নিজেকে অন্যের থেকে বুদ্ধিমান মনে করে। বিষ্টপুরের কিছু মানুষ প্রশ্ন তুললো—আমরা এত খেটে জাল নৌকা করছি এর মালিক হবে কে?

সঙ্গত প্রশ্ন। এ সবের মালিক হবে কে? কে হবে মহাজন?

অনেকের চিন্তায় ঢেউ তুললো। আমরা শ্রম দেব নেপোয় মারবে দই? এ হতে পারে না।

ঠিক বে-ঠিক এর দ্বন্দ্বে-তর্কে মীমাংসা হয়নি। শেষে হাতাহাতি মারামারি। গোকুলের লাঠির আঘাতে মাথা ফাটলো মোহনের। সেই নিয়ে হৈ হৈ ধুন্ধুমার, গাঙে জাল দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল কয়েকদিন। গ্রামের মানুষ দু'ই শিবিরে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। কিছু মানুষের যুক্তি মোহন ঠিক। কারো কারো বক্তব্য গোকুল যা বলছে এটাই ঠিক।

ঝগড়া কাজিয়ার ফাঁকে সমবায়ের বোর্ডটি খুলে নিয়ে পালালো কেউ।

কার্ত্তিক মৈনুদ্দিন হাবুল বাদল চেষ্টা করলো যুযুধান দু'পক্ষকে শান্ত করতে। লড়াই শেষ হয়নি। এখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে সর্বনাশ হবে। শক্তি ক্ষয় হবে। ঐক্যে ভাঙন ধরবে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। উভয় পক্ষ নিজেদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে মরিয়া।

নিরুপায় কার্ত্তিক গেল ব্লক অফিসে।

বি. ডি. ও. এসে বুঝিয়ে বললেন—

—ও জাল নৌকা বা সমবায়ের অন্য সম্পত্তি কারো একার হবে না। যারা সমবায়ের সদস্য ওর মালিক তারাই। যারা এখনো সমবায়ের সদস্য হননি অবিলম্বে সদস্য হয়ে যান। অনিলবাবুকে দশ টাকা দিয়ে নাম লেখান। নগদ টাকায় সদস্য হতে না পারলে সমবায়ের হয়ে শ্রম দিন। শ্রমের জন্য মজুরি দেওয়া হবে। এবং মজুরির একটা অংশ কেটে সদস্য করে নেওয়া হবে। তাতে মজুরিও পাবেন লভ্যাংশ পাবেন। প্রয়োজনে এই সমবায়কে আরো বৃহৎ এবং বহুমুখী করার পরিকল্পনা আছে। নিজেরা ঝগড়া মারামারি করে এমন একটা সম্ভাবনাকে নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন সমবায় আমার নয় আপনাদের। একে বাঁচানোর দায়িত্ব আপনাদের। কোন বিশেষ মানুষের কথায় মাথা গরম করবেন না। যদি কোন সমস্যা আসে সরাসরি আমার কাছে আসবেন। সরকারের হাত সর্বক্ষণ আপনাদের দিকে। মনে রাখবেন সমবায় বাঁচলে আপনারা বাঁচবেন।

বি. ডি. ও. সাহেবের কথা ভাবালো সবাইকে। মারামারি করলে কি লাভ হতুক। বেলাক বাবু হক কথা বলেছে। গোকুলের হাত ধরে বি. ডি. ও.'র সামনে এসে দাঁড়ালো মোহন। মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

—আমরা আর মারামারি করবুনি বাবু।

মোহনের বলার ভঙ্গিতে হাসলো সবাই। বি. ডি. ও. পুনরায় বললেন—

—হ্যাঁ এই ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকুন। নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে

পারবেন। কারো কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে হবে না। কেউ বঞ্চিত হবেন না। কেউ ঠকাবে না। আপনাদের হক অন্যের ঘরে উঠবে না।

বি. ডি. ও. বিষ্টুপুরের মানুষদের বোঝালেও সন্দেহ থাকলো সমবায় আদপে দাঁড়াবে কিনা। মানুষগুলো সৎ, শিক্ষা কম। বোঝে অল্প। অনেক জায়গায় নিজেদের মধ্যে মিল থাকলেও অমিল অনেক জায়গায়। পরস্পরের প্রতি যেমন ভালবাসা আছে তেমন আছে রেষারিষি। ঈর্ষা। সন্দেহ, দোষারোপ।

তিন মাসের মধ্যে সাবালক হয়ে উঠলো বিষ্টুপুর মৎসজীবী সমবায় সমিতি। অবিশ্বাস্য অগ্রগতি।

বি. ডি. ও. বিস্মিত।

দ্রুত বাড়ছে সমবায়ের সম্পদ। সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা বুঝতে শিখছে বিষ্টুপুরের মানুষ। প্রতিদিন সদস্য বাড়ছে। যারা মাছমারা পেশায় যুক্ত নয় তারাও সমবায়ের খাতায় নাম লেখাচ্ছে।

ইলিশমারাদের ম্লান মুখে হাসি ফুটেছে। তাদের ঘরনীদের অঙ্গে নতুন শাড়ি উঠলো। রুক্ষুচুলে তেলের ছোঁয়া পেল। ছেলে মেয়েদের শরীরে উঠলো নতুন পোশাক।

অনেকবছর পর জেলে বউদের দেখা গেল আরশির সামনে বসে চুলে কাঁকুই দিতে।

ইলিশমারাদের সার্বিক চাহিদা পূরণ হলো না বটে কিন্তু কয়েক-পুরুষের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে প্রথম দেখলো স্বাধীনতার সূর্যকে। কয়েক প্রজন্ম মহাজনী ফাঁসে বাঁধা ছিল এখন মুক্তির স্বাদ কেমন অনুভব করছে। প্রশ্বাস নিচ্ছে মুক্ত বাতাসে। বাপ ঠাকুরদার মুখে স্বর্ণ যুগের কাহিনী শুনেছে। নিজেদের জাল, নিজেদের নৌকা। গাঙ ভরা রূপালী ইলিশ। ভাগীদার নেই। জালে ধরা সব ইলিশ নিজের। জেলে পাড়ার

জৌলুষের কথাও শুনেছে। আজ সব গল্প মনে হয়। সেই গল্পের দিন আবার ফিরে আসছে।

॥ ১৩ ॥

প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি খগেন। জাল বন্ধের নোটিশটা আর পাঁচটা স্বাভাবিক ঘটনার মত সহজ সরল করে ভেবেছে। কাত্তিকের জেদটাকেও ভেবেছে এলে বেলে। ছোটলোকরা অমন কথা বলে, শেষ পর্যন্ত রাখতে পারে ক'টা ? কয়েকদিন যাক। পেটে টান পড়লে হাতজোড় করে এসে দাঁড়াবে।

ভূতো শালা কতদিন ওদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে। রস আপনি শুকিয়ে যাবে।

সমবায় ? ফুঃ। যাদের মাগের পোঁদে ট্যানা নি তারা করবে সমবায়! ছুর ছুর, তার থেকে যদি শুনতুম হাতি আগাশে উড়ছে বিশ্বাস করতুম। ব্লক বাবুটাও আচ্ছা গবেট। হাভাতেদের দিচ্ছিস লোন! সব খেয়ে ফেলবে। নিজের টাকা হলে গায়ে লাগতো। পরের টাকা দু'হাতে বিলোচ্ছে। শালা হারামি। গরমেনের টাকায় দানছত্র খুলেছে।

তিন মাস জাল বন্ধ। খগেন বলছে আরো থাকুক। রস মরুক শালাদের। ভূতোর জোরেই ওদের জোর। 'খুঁটোর জোরে ম্যাড়া লড়ে' দেখি ভূতো কত টাকা দেয়।

খগেনের ভুল ভাঙলো অনেক পরে। হরি মোড়লের মুখে শুনে অবাক হলো। সমবায়ের জাল নৌকা বেড়েছে। বেড়েছে সুনাম, সম্পদ। জেলেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে দেখেই বুঝতে পারছে। কথায় টান বেড়েছে। শরীরে জেল্লা বেড়েছে।

এতদিনের, এত মেহনতের গড়া স্বর্ণমিনার কি ভেঙে পড়ছে!

ধূলিসাৎ হয়ে পড়বে আকাশছোঁয়া শ্বেত পাথরের প্রাসাদ। মাথায় হাত দিয়ে বসলো খগেন। জেলেদের যদি জাল নৌকা হয়, মহাজনী করবো কাকে নিয়ে? ওরা স্বাবলম্বী হলে আমার ব্যবসা লাটে উঠবে। হায় হায়!

নদীতে এতকালের মৌরসী-পাট্টা চুরমার হয়ে যাবে যদি শালাদের শায়েস্তা করা না যায়।

সদরে যাবার পথে লখিমপুরের সাঁকোর কাছে বিষ্টুর সাথে দেখা হলো খগেনের।

—বিষ্টু দেশের খোঁজ খবর কিছু রাখো? তোমার ওখানেও শুরু হয়েছে নাকি?

কাঁচা খিস্তি ঠোঁটে এসেও সামলে নিল বিষ্টু। জেনে শুনে শালা ন্যাকামি করছে। হুতুমের বাচ্ছা।

—ঝড় লাগলে সব গাছেই লাগে দাদা।

—তা তো লাগবেই। কিন্তু মরশুমটা দোরাস জলে গেল। ভেবেছো কিছু?

—এখনো কিছু করে উঠতে পারিনি দাদা। ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। শুয়ারের বাচ্ছারা বেশিদিন বন্ধ রাখলে আমার ভাত ভিত বন্ধ। কি যে হবে।

বিষ্টুর কথায় হতাশা।

খগেন আত্মবিশ্বাস রেখে বললো—এমনি করে মুখ বন্ধ করে বসে থাকলে চলবে না হে। কিছু একটা করতে হবে। নিজেদের দলাদলি ভুলে এক হয়ে লড়তে হবে ছোটলোকদের বিরুদ্ধে। আমাদের লোক ভাঙিয়ে নেওয়া বন্ধ করতে হবে। আমার লোক তুমি নেবে না। তোমার লোক আমি নেবো না। বিষ্টুর অভিব্যক্তি বোঝার জন্য সাময়িক বিরতি দিল খগেন। কোন শালাকেই বিশ্বাস নেই।

লোক নিয়ে অনেক রেষারিষি মহাজনদের মধ্যে। সুযোগ বুঝে বেশি

মজুরি কবুল করে এক মহাজন অন্য মহাজনের দক্ষ দাঁড়ি মাঝি ভাঙিয়ে নেয়। এবছরই খগেনের কাছ থেকে শম্ভুকে ভাঙিয়ে নিয়েছে বিষ্টু। আকারে ইঙ্গিতে কি সেই কথাটাই স্মরণ করালো খগেন। বিষ্টুও বুঝলো খগেন মামদোবাজি করছে। টাকার জোরে তুমিই লোক ভাঙাও বেশি। এখন সাধু সাজছো।

—ছোটলোকরা বড্ড বেড়েছে। দু'টো টাকার জন্যে তিন ঘণ্টা বাকুলে বসে থাকতো এখন তারা মাথায় উঠতে চাইছে। টেনে কথা বলছে। সকাল বিকাল ব্যাগ নিয়ে বাজারে যাচ্ছে। না না। চুপ করে বসে থাকলে চলবে না হে। ভাবতে হবে, কিছু করতে হবে। তুমি হাসান আর গদাইয়ের সঙ্গে কথা বলো। বিহিত কিছু করতে হবে। শালা নতুন বি. ডি. ও. যত নষ্টের গোড়া। ওই শালা আস্কারা দিচ্ছে। তুমি আমার নাম করে সতীশের সঙ্গে কথা বলো। শালাকে বদলি না করলে শান্তি নেই। কাল সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে এসো। আলোচনা করা যাবে।

খগেন চলে গেলে চিন্তিত হলো বিষ্টু। কিছু একটা করতেই হবে। প্রথমে ভেবেছিল ঝড়টা খগেনের ওপর দিয়েই যাক। খগেন ডুবলে আখেরে লাভ। প্রতিপক্ষ জব্দ হলে ব্যবসা ভাল চলবে। শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু এখন ঝড় সব গাছকেই দোলাচ্ছে। কে আগে ভাঙবে সেটাই চিন্তার। খগেনের তবু জায়গা জমি, অন্য ব্যবসাও আছে। কিন্তু আমার ভরসা ওই জাল নৌকা। গাঙে যদি জাল না পড়ে 'শেলে' 'শুকোয়' নৌকা না যায় তাহলে উপোসই ভবিতব্য।

আগামী পয়লা বৈশাখ নতুন পালা নামাচ্ছে বিষ্টুপুর যুবক সংঘ। মহড়ার শেষে অনেক রাতে দোকান বন্ধ করে বাদল সহ সবাই ফিরে গেল। গভীর রাতে গ্রামের মানুষ দেখলো দাউ দাউ করে জ্বলছে বাদলের দোকান। বালতি কলসী নিয়ে ছুটে এলো সবাই। কিন্তু খড়ের ছাউনি দেওয়া ছিটেবেড়ার ঘর বারুদের মত জ্বলছে।

বাদলের চোখের সামনে ছাই হয়ে গেল দোকানটা। অত মানুষের

চেষ্টাতেও রেহাই পেল না কাঠ বাঁশ খড়। অগ্নিদেব পই পই করে চাটলো সব কিছু। বাদল কাঁদলো সব হারানোর হাহাকারে। ছোট দোকানটাই তার সব। ওতেই রুটি রুজি। সংসার প্রতিপালন। দোকানদার মানুষ। শত্রু কেউ নয়। সবার সাথেই সখ্যতা। সবাই আপন। অনেকরকম মানুষ বসে তার দোকানে। তারা খদ্দের। লক্ষ্মী। আগুন কেন, কিভাবে লাগলো কেউ জানে না। কেউ বললো—

—আঁচের আগুন থেকেই অগ্নিকাণ্ড। বাদল বললো—না। প্রতিদিনের মত ভাল করে আঁচ নিভিয়ে তবে বাড়ি গেছি। কেউ বললো—মহড়ার লোকেরা কেউ জ্বলন্ত বিড়ি ফেলে গিয়েছিল। তাতে থেকেই অঘটন। বাদল মাথা নাড়লো। তা সম্ভব নয়। মহড়ার শেষে দোকানে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে তবে বন্ধ করেছি।

আসলে কেউ তাকে ভাতে মারতে চেয়েছে।

পরেরদিন ঠিক একই সময়ে মধ্যরাতে খগেন জানার খড়ের গাদায় আগুন লাগলো। গহিন রাতের অন্ধকার কেটে সে আগুনের লকলকে জিভ দেখা গেল অনেক দূর থেকে। ছুটে এলো গ্রামবাসীরা। কিন্তু অগ্নিদেব যেন প্রতিজ্ঞা করেই এসেছে সব কিছু শেষ করে দেবে। বহু মানুষের প্রাণপণ চেষ্টাতেও গাদা বাঁচলো না। আট কাহন খড় পুড়ে পুড়ে ছাই হলো। গ্রামের বাতাস ভারি হয়ে উঠলো খড় পোড়া কটূ গন্ধে।

আতঙ্কে কাঁপছে গ্রামের বাতাস। অগ্নিদেব রুষ্ট হয়েছেন। গ্রামের মধ্যে নিশ্চয় কেউ সজ্ঞানে অনাচার করেছে। পুনরায় বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কায় আতঙ্কিত সবাই। কখন কার সর্বনাশ হয়, কার ঘরে আগুন লাগে। অগ্নিদেব কুপিত হলে অল্পে নিস্তার পাবে না মানুষ। আরো অগ্নিকাণ্ড ঘটবে, চাই কি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। অতীতে এমন নজির আছে। ব্রহ্মার অভিশাপে গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত হয়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে আগুন একঘর থেকে অন্য ঘরে ছড়িয়েছে। মানুষের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সব সঞ্চয়, সব সম্পদ উদরস্থ করে থেমেছে সে ধ্বংসলীলা।

পরের রাতে পুনরায় অগ্নিকাণ্ডের সংবাদের দুঃস্বপ্ন নিয়ে বিছানায় গেছে বিষ্টুপুরের মানুষ। না। গভীর রাতে অগ্নিদেব এলো না। পুলিশের ভারি বুটের শব্দে গ্রামের মেঠো পথ কেঁপে উঠলো। টর্চের তীব্র আলোয় চমকে উঠলো গাছ গাছালি।

স্বামীকে একহাতে বেষ্টন করে ঘুমাচ্ছিল সরলা। দরজায় ধাক্কার শব্দে ঘুম ভাঙলো।

—এ্যাই শুনছো। ছ্যাখোনা বাইরে কারা।

শ্রীকান্তকে ধাক্কা দিয়ে জাগালো সরলা। সরলা চিরকাল ভয়কাতুরে। সামান্য কারণে ভয় পায়। শ্রীকান্ত ভাবলো আজো তাই। জড়ানো কণ্ঠে বললো—

—কোন শালারে। পালা। আমার মাগ ভয় পাচ্ছে।

—বেরিয়ে আয় শুয়ারের বাচ্ছা।

দমাদ্দম লাথি পড়লো আগড়ের দরজায়। পলকা বাখারির দরজা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো। সবল একটা হাত বিছানা থেকে টেনে তুললো শ্রীকান্তকে। দাওয়ায় এনে পাছায় লাথি মেরে মুখ থুবড়ে ফেললো উঠোনে।

পুলিশ! শ্রীকান্ত হতবাক। পুলিশ কেন? পুলিশ আসার মত কোন ঘটনা ঘটেনি গ্রামে।

—ওঠ, শালা গাড়িতে ওঠ।

একজন কনষ্টেবল ঠেলে গাড়িতে উঠিয়ে দিল শ্রীকান্তকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে হতচকিত সরলা। সম্বিৎ ফিরলে দৌড়ে গেল গাড়ির কাছে।

—অকে তোমরা নিয়ে যাচ্ছো কেন?

পুলিশের কেউ একজন ব্যঙ্গ করে বললো—

—রাজভোগ খাওয়াতে। ভাগ শালী।

গাড়ি চলে গেল। সরলার জ্ঞানে কুলোচ্ছে না কেন মানুষটাকে নিয়ে গেল পুলিশ।

রাতে কত সুখের কথা বলেছে। নতুন নতুন পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছে। বলেছিল দু'মাস পরে সুধীরের বউয়ের মত রূপোর বালা গড়িয়ে দেবে। বলেছিল নতুন শাড়ি কিনে আনবে।

ছেলেকে বুকে ধরে কাঁদলো সরলা। অনেক কাঁদলো। কান্না শুনে পড়শিরা এসে জানলো শ্রীকান্তকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। তারা সান্ত্বনা দিল। সহানুভূতি জানালো।

তাতে কি শূন্য বুকের হাহাকার কমবে?

মুখটাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র সরলার। উঠোনে দাঁড়িয়ে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে মুখের আগল খুলে দিল।

—ঢ্যাম্‌না, কালামুখো। নিব্বংশে রাঁড়ির ভাতাররা গোল্লায় যা। গাঙের চড়ায় যা। জোড়া ব্যাটার মাথা খা। হাড় হাভাতির ব্যাটারা মব মর। মুখে অক্ত উঠে মর। ভাগাড়ে যা। শুগ্‌নিতে চোখ খুলে খাক। তোদের মাগ বেধবা হোক, লগরে লাঙ করুক।

শ্রীকান্ত গাড়িতে উঠে দেখলো অনেক চেনা মুখ। সুধীর শম্ভু কালীপদ হাবুল নবীন মোহন গোকুল এমনকি দোকানদার বাদল পর্যন্ত। কী ব্যাপার! পুলিশ আমাদের কেন নিয়ে যাচ্ছে।

—শালা খগে······

জব্বর একটা গালাগাল ছুড়তে গিয়েও সামলে নিল কালী। পুলিশের সামনে সংযত থাকাই উচিত। শুধু প্রচণ্ড ঘৃণায় একদলা থুথু নিক্ষেপ করলো জালের বাইরে।

শ্রীকান্ত দেখলো কালীর ধারণা অভ্রান্ত। খগেনের বিরুদ্ধে যারা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে তাদেরই ধরেছে পুলিশ। গাড়িতে নেই কাত্তিক আর মৈনুদ্দিন।

বাদল বললো—তোকেও আনলো?

পুলিশের অত্যাচারে সবাই অল্পবিস্তর ক্ষতবিক্ষত। রক্তাক্ত। নবীন কাঁদছে। বয়স কম, জীবনে অভিজ্ঞতার পরিধিও অল্প। পুলিশের

অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত। জীবনে পুলিশের জাল ঘেরা গাড়িতে ওঠেনি। এতক্ষণ গুমরে গুমরে কাঁদছিল। শ্রীকান্তকে দেখে শব্দ করে কেঁদে উঠলো।

—পুলিশ সাহেব আমি কিছু করিনি। আমাকে ছেড়ে দাও।

—হেই শালা শুয়ারের বাচ্ছা। চেল্লাসনি।

পুলিশের এক ধমকেই থেমে গেল নবীন। কিন্তু তার বুকের মধ্যে থেকে কান্নার ঢেউ চল্‌কে উঠছে। কয়েকমাস পূর্বে বিয়ে করেছে, স্ত্রীর শরীরে এখনো নতুনের গন্ধ ঝাপটা দেয়। এখন এই ভোর রাতে স্ত্রীর মুখখানা মনের আয়নায় চকচক করছে।

পুলিশ মানেই আতঙ্ক।

পুলিশ মানেই সন্ত্রাস।

এখন নিয়ে যাচ্ছে কখন ছাড়বে কে জানে। যদি না ছাড়ে। যদি যাবজ্জীবন জেল হয়। নতুন বউ থাকবে কেমন করে! এক ঝাঁক কান্না নবীনের বুকের মধ্যে ওগলাচ্ছে। ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

—মাগীদের মত ফোঁস ফোঁস করছিস কেন? ধমকালো হাবুল। কাঁদলে তোকে ছাড়বে? 'গু মাখলে যমে ছাড়ে?'

ভোরের ভিজে বাতাস চিরে পুলিশের গাড়ি চলে গেল থানায়। পশ্চাতে রেখে গেল অনেক নারীর কান্না হা হুতাশ অভিশাপ। অনেক পুরুষের ক্ষোভ, ক্রোধ, ঘৃণা।

তরল আঁধারে ঢাকা পৃথিবী। অস্পষ্ট ছায়া ছায়া ভোর। রাতপাখির শেষ ডাক গাছেদের মগডালে।

—এই দিদি বোনাইদাদা কোথারে?

উঠোনে তুলসীতলায় ন্যাতা দিচ্ছিল মঙ্গলা। ঝুজকো বেলায় সরলাকে দেখে অবাক হলো।

—কীরে এত সোকালে? মাগ ভাতারে ঝগড়া করিছিস?

দৌড়ে আসার জন্যে হাঁপাচ্ছে।

—অকে পুলুশে ধরে লিয়ে গেছে গো।

—কী হয়েছ্যাল? পুলুশে ধরে লিয়ে গেল?

—কি জানি গো দিদি।

সন্ধ্যার জোয়ারে জাল তুলে ইলিশগুলো সমবায়ের দপ্তরে জমা দিয়ে শ্রীকান্ত কার্ত্তিক হাবুল নবীন এক সাথেই ফিরেছে। ভাটার গাঙে কার্ত্তিক পুনরায় গেছে ফেটি জাল নিয়ে। যা আসে, অতিরিক্ত উপার্জন। কার্ত্তিক বিশ্বাস করে যতদিন গতর আছে, শরীরে শক্তি আছে ততদিন সবাই আপন। পৃথিবী আপন। গতর গেল তো সব গেল। যতদিন গতর আছে খাটো, উপার্জন করো, ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করো। গতর যখন থাকবে না ওই সঞ্চয় ভাঙিয়ে খাও।

মঙ্গলা বললো—গাঙে গেছে, বোস্ না। এ্যাসবার সোময় হয়ে গেছে।

সূর্যোদয়ের পূর্বেই ফিরলো কার্ত্তিক। অসময়ে সরলাকে দেখে রসিকতা করতে গিয়ে থমকে গেল। সরলা গ্রাম সুবাদে শালী। রসিকতার সম্পর্ক, কার্ত্তিকই যোগাযোগ করে শ্রীকান্তর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, সময় সময় হাল্‌কা চটুল রসিকতা করে। সরলাও ছাড়ে না, উল্টে রসিকতার জবাব দেয়।

সরলা আজ কাঁদছে। স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া মারামারি করে হঠাৎ হঠাৎ এখানে চলে আসে। তখন কাঁদে না। সুখেই থাকে, উল্টে শ্রীকান্তকে জব্দ করতে পেরেছে বলে গর্বও করে। এমন অনেকদিন ঘটেছে। শ্রীকান্ত দু' তিন দিন পরে সাধ্য সাধনা করে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

স্ত্রীর মুখে শ্রীকান্তের সংবাদ শুনে হতচকিত। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না এ খগেন জানার প্রতিশোধ। পুলিশ দিয়ে শায়েস্তা করতে চাইছে। মেরুদণ্ড ভাঙতে চাইছে সমবায়ের। সরলাকে বসিয়ে রেখে গ্রামে বের হলো কার্ত্তিক। গ্রামের পরিবেশ থমথমে। এখানে ওখানে মানুষের জটলা। সবার চোখে মুখে আতঙ্ক। বিস্ময়!

অনেককেই পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে কেউ কেউ। মৈনুদ্দিনকে বাড়িতেই পেল কার্ত্তিক।

—চাচা পুলুশ তোমাকে ধরেনে ?

দাড়িতে হাত বুলিয়ে মৈনুদ্দিন বললো—বাড়িতে পুলুশ এয়েছ্যাল। হাঁড়িকুঁড়ি ভাঙচুর করেছে, মোকে পায়নে। মুই সন্তোষের দলিজে শুয়েছ্যালুম।

গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত, পুনরায় কি কোন রক্তাক্ত ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। গ্রামে পুলিশ আসার অর্থ অঘটনের ইঙ্গিত।

—এখুন তাইলে কী হবে চাচা ?

—ভাববার কথা। পুলুশে যকুন ধরেছে জামিন করতে হবে। অনেক ট্যাকার দরকার। চল দেখি গেরামের অবস্থা। কে কোথায় আছে। কিন্তু তোকে কেন পুলুশে ধরলো নি, অবাক কাণ্ড।

—সেটাই ভাবছি, খগেন আমাকে ভুলে গেল !

একটু পরেই অবশ্য ভুল ভাঙলো দু'জনার। আমড়াতলার মোড়ে আসতে খোকা দাস বললো—

—পুলুশের কাণ্ড দেখোদিনি। পাগলা কার্ত্তিককেও ধরে নিয়ে গেছে।

পাগলা কার্ত্তিক কারো সাতে পাঁচে থাকে না, ভিক্ষা করে। তাকেও ধরলো পুলিশ !

—ইবার বুঝলুম ব্যাপারটা। পুলুশ তোর বদলে পাগলা কার্ত্তিককে ধরেছে। দাসের বদলি মোড়লকে ধরেছে। চিনতে ভুল করেছে শালারা।

বারোজনকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ কেউ জানে না। কার্ত্তিক মৈনুদ্দিন খোকাসহ কয়েকজন পরামর্শের জন্যে গেল নরেন মাস্টারের বাড়ি। শিক্ষিত মানুষ, সৎ পরামর্শ দিতে পারে। দেয়ও, মানুষের বিপদ আপদে যুক্তি পরামর্শ দেয়।

নরেন মাস্টার স্থানীয় মানুষ নয়, বিষ্টুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। কোন ঝামেলায় থাকে না। শনিবার দেশে ফিরে যায়, সোমবার সকালে চলে আসে।

মাস্টার সব শুনে চিঠি লিখে দিয়ে বললেন—

—আমার চিঠি নিয়ে অবিলম্বে বিরলাপুরের কল্যাণ উকিলের সঙ্গে দেখা করুন। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কল্যাণ আমার বন্ধু আপনাদের সব করে দেবে।

উকিল শুনে বললেন—অনেক টাকার ব্যাপার। টাকা এনেছেন?

মুখ চাওয়াচায়ি করলো যারা গিয়েছিল। ট্যাকা পাবো কোথায়? নরেন মাস্টার তাইলে কি লিখলো!

—বিনা টাকায় কোর্ট কাছারি হয় না। বারো জনের জামিনে অনেক টাকা লাগবে।

—মোরা গরীব মানুষ। গাঙে জাল ফেলি, ট্যাকা কোথায় পাবো উকিলবাবু। আপনি ব্যবস্থা করে দ্যান। আমরা আপনের গোলাম হয়ে থাকবো চিরকাল।

হাত জোড় করে বললো মৈনুদ্দিন।

খানিক নীরব থেকে 'উকিল ভাবলেন কিছু। গরীব মানুষরা প্রয়োজনীয় টাকা পাবে কোথায়। ওই তো চেহারার হাল। তাছাড়া নরেন অনুরোধ করেছে।

—করতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত।

শর্ত! সে আবার কি! লেখাপড়া জানা ভদ্দর নোকরা কেমন যেন সোজা সরল নয়। ট্যারা বাঁকা। সোজা কথাকে বাঁকিয়ে বলে। এই কথাতেও শর্ত!

—বলেন উকিলবাবু।

—ভাল ইলিশ খাওয়াবি?

হতচকিত সবাই। উকিলবাবু কি মস্করা করছে। পরস্পরের দিকে তাকালো।

—হ্যাঁ বাবু ভাল ইলিশ খাওয়াবো।

সমস্বরে বললো সবাই। এটা এমন কি শর্ত। অতি সহজ।

—কালই দিয়ে যাবো।

অতি উচ্ছ্বাসে বললো কার্ত্তিক।

সাতদিন পর জামিন হয়ে ঘরে ফিরলো সবাই। হাজতের ভাত খেয়ে কাহিল। মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। কিম্ভুত কিমাকার চেহারা।

জাল বন্ধ ছিল সাতদিন। পুনরায় জাল পড়লো গাঙে। মানুষগুলোর বুকের গহিনে গন গন করে জ্বলছে, খগেনের টুঁটি ছিঁড়ে তছনছ করলে তবেই নিভবে সে আগুন। কিন্তু উকিল বলে দিয়েছে গ্রামে ফিরে কোন ঝামেলায় জড়াবি না। চুপচাপ থাকবি।

মনের ক্রোধ মনে চেপে রেখে হাল ধরলো। দাঁড় ধরলো। নৌকা ভাসালো গাঙে।

—বদর বদর।

বিকালে জোয়ার ছিল। ফিরতে খানিকটা রাত গড়িয়েছে। খেয়ে শুতে আরো খানিকটা। ঘুম আসতে আরো কিছুক্ষণ। মধ্যরাত গত প্রায়, ঘুম ভাঙলো কালীর। কে যেন কাঁদছে। মধ্যরাতের তরল আঁধারে ছায়া ছায়া স্বর, বিছানায় উঠে বসলো! রাধা বিছানায় নেই। কোথায় গেল রাধা। অজানা আতঙ্কে বুক দপ দপিয়ে উঠলো।

—রাধা।

কেউ সাড়া দিল না কালীর ডাকে।

দরজা খুলে দাওয়ায় এলো। দাওয়ায় বসে একটা ছায়ামূর্তি।

—রাধা।

রাধা নিরুত্তর।

—কী হয়েছে রাধা? কাঁদছিস কেন?

মধ্যরাতের নিঝুম প্রকৃতি। ফিকে জ্যোৎস্নার হাল্‌কা মসলিন বিছানো চরাচরে।

—রাধা।

পুনরায় ডাকলো কালী। আদরভরা হাত রাখলো মাথায়। কোন কথা ফুটলো না রাধার মুখে। মোমের মত গলে পড়লো স্বামীর বুকে। কেমন করে বোঝাবে মনের কথা। বুকের ভেতরটা যদি দেখাতে পারতো তাহলে বুঝতো কিসের তোলপাড় চলছে সেখানে। সব হারিয়ে আমি তোমার কূলে নোঙ্গর বেঁধেছি। তুমি আমার সব। আশা ভরসা স্বপ্ন সাধ। মান অভিমান অহংকার। তোমার যদি কিছু হয় আমি দাঁড়াবো কোথায়। এখন আমি একা নয়, আমার ভেতরে একজন তিল তিল করে বাড়ছে প্রতিদিন। সেও যে তোমার মুখাপেক্ষী।

কালী নীরব। রাধা কাঁদুক। কেঁদে হাল্‌কা হোক, দুঃখ ঝরে পড়ুক কান্না হয়ে।

অনেকটা পরে কালী ডাকলো—

—রাধা।

—উঁ।

—কাঁদিস কেন?

—আমার ভয় করছে।

—কীসের ভয়?

উত্তর যোগায় না রাধার ঠোঁটে। ভয়ের রূপটা কেমন জানে না। ভয়টা আসলে হারাবার ভয়, পেয়ে হারানোর ভয়।

কালী যখন পুলিশ হেপাজতে ছিল পড়শিরা অনেক ভয়ের কথা শুনিয়েছে। আশঙ্কার কথা শুনিয়েছে। পুলিশরা ভাল মানুষ নয়। ভাল মানুষদের অকারণে খুন করে।

—আমার বুকের ভেতর কেমন করছে।

রাধার বুকে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো কালী। একটানা ছন্দোবদ্ধ স্বর্গীয় শব্দ বেজে চলেছে অবিরাম। এ শব্দ সৃষ্টির আদিকাল থেকে বাজছে মানুষের বুকে।

—তুমি আর ওসব ঝামেলায় যাবে নে বলো?

কান্না ভেজা গলায় বললো রাধা।

—কেন ?

—যদি কিছু হতুক !

—কিছু হবে না। আমরা অনেক মানুষ আছি না।

স্বামীর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে রাধা বললো—

—কি জানি, আমার ভয় করে।

॥ ১৪ ॥

দশটা জাল পড়েছে গাঙে। সঙ্গে আছে দশটা নৌকা। পঞ্চাশজন মানুষ। নদীর বুক ইলিশমারাদের দখলদারি। আসার পথে মৈনুদ্দিন সতর্ক করেছে সবাইকে।

সাতদিন পর জাল পড়ছে গাঙে। মহাজনের আক্রমণ একবার এসেছে। আরো আসবে। অনেকবার আসবে। এবং সে আক্রমণ আরো নৃশংস হতে পারে।

বয়েসের অভিজ্ঞতায় মৈনুদ্দিন দেখেছে গরীবের বাড় বাড়ন্ত ধনীর সহ্য হয় না। চোখ টাটায়। এ লড়াইয়ে সহজে জিত হবে না। মহাজনরা সহজে ছেড়ে দেবে না এতদিনের অধিকার। আক্রমণ যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে যে কোন দিক থেকে।

—ওরে ছোঁড়ারা সাবধানে থাকিস। সাপকে ঘেঁটিয়েছিস তাল পেলেই কেমড়ে লেবে।

বৃষ্টি ঝরা রাত না হলেও আকাশে তরল মেঘ আছে। প্রত্যেক নৌকায় চারজন দাঁড়ি একজন মাঝি। পাঁচজন মানুষ। অন্ধকার নদীর বুকে নৌকা ভাসছে।

ছইয়ের নিচে জ্বলছে কেরোসিনের আলো। জোয়ারের ঢেউ আছড়ে

পড়ছে নৌকার পাছায়। নৌকা দুলছে। আলো দুলছে। ছায়া কাঁপছে জলে। ক্লান্ত শরীর পাটায় এলিয়ে দিয়েছে দাঁড়ি। হালে মাঝি সতর্ক। অভিযানের কাণ্ডারী সে। দলনেতাও বটে। পাঁচজন মানুষের ভালমন্দ তার হাতে।

বস্তুর যেমন পৃথক গন্ধ আছে। তেমনি প্রতিটা বস্তুর পৃথক শব্দ আছে। চেনা একটা শব্দে চমকালো কার্ত্তিক। এত রাতে কার নৌকা। অভিজ্ঞ কানে বুঝলো কাছাকাছি কোথাও নৌকা চলছে। ছোট দাঁড়ের ছিপ ছিপ শব্দ বাজছে। মধ্যরাতে একমাত্র মাছমারা নৌকা রাত পাহারা দেয়।এ তাহলে কার নৌকা! সতর্ক হলো কার্ত্তিক। বাতাসে রহস্যের গন্ধ। তারার আলোয় ছায়া সরা নদীর জলে দু'টো কালো অবয়বকে চলতে দেখে চিৎকার করলো।

—কুন শালারে?

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো নৌকা থেকে অনেক কণ্ঠ চিৎকার করে উঠলো। ভয়ে, আতঙ্কে, আশঙ্কায়।

—কী হলো? কী হলো ওখানে? কে চেঁচালো ওদিকে?

অনেক মানুষের অনেক প্রশ্ন উত্তরে আঁধার নদীর বুক সরগরম হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কেউ বুঝতে পারছে না কি ঘটলো হঠাৎ।

হৈ হল্লার মধ্যে আগন্তুক নৌকা দু'টি চুপিসারে সরে পড়লো কেউ কিছু বোঝার পূর্বেই।

কাছাকাছি নৌকার মানুষ জানতে চাইলো কার্ত্তিকের কাছে।

খুড়ো কী হয়েছ্যাল? অমন করে চেঁচালে কেন?

দু'টো নৈকো ভূতের প্যানা কি করছেল হুইখানে।

কোথায়?

—কালীর জালের কাছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কার্ত্তিক।

—এক মুহুরি তাইলে গেল কোথায়?

—তাই তো ভাবছি।

মোহন বললো—তোমার চোখ খারাপ হয়েছে। কালীর নৌকোর কাছে সে দেখলো না তুমি দেখলে? কে তোমাকে ভয় দেখাতে আসবে রাত গউনে?

হাবুল কার্ত্তিকের নৌকার দাঁড়ি। সে কিছু দেখেনি। সে বললো—

—তুমি গাঙ ভূত দেখেছো।

কার্ত্তিক নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না এমন ভুল হলো কি করে! নতুন নৌকার গন্ধ টের পেয়েছে।

অচেনা দাঁড়ের শব্দ স্পষ্ট শুনেছে। নিশ্চয় অন্য নৌকা এসেছিল কাছাকাছি। ভূত পেরেত নয়। ইত্তিপূর্বে তু'একবার গাঙ ভূত দেখেছে কার্ত্তিক। রাত গহিনে যারা গাঙে নৌকা ভাসায় তারা অনেকেই দেখেছে। গাঙ ভূত কখনো দৃশ্যমান, কখনো অদৃশ্য। ঝড়ের রাতে জল নিয়ে হুটোপুটি করে। হাসে কাঁদে গান গায়। তীব্র শিসের শব্দ তুলে ছুটে যায় নদীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। অমাবস্যার রাতে আলো হাতে নদীর চরে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ হঠাৎ নৌকার ওপর এসে দাঁড়ায়। নৌকার আশপাশে ঘোলা জলে প্রচণ্ড ঘূর্ণি তোলে। রাম নাম করলে পালায়।

কার্ত্তিকের কথা কেউ বিশ্বাস করলো কেউ করলো না। কিন্তু জোয়ারের নিদানে জাল তুলে অবাক হলো কালী। নৌকার সাথে খানিকটা মাত্র জাল বর্ত্তমান বাকিটা নেই। চোঙা নেই। তাজ্জব ব্যাপার। এতবড় জাল গেল কোথায়!

আর এক দফা হৈ হট্টগোলের শেষে মৈনুদ্দিন বললো—এ শালা মহাজনের কাজ। চোঙা কেটে জাল ডুবিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যিস কার্ত্তিক দেখতে পেয়েছ্যাল নাহ'লে আরো সব্বনাশ হতুক। অনেক জাল কাটতো। সবাই হতবাক। এমন ঘটনার কথা পূর্বে শোনা যায়নি। মহাজনের নয়া কৌশল।

ইলিশমারাদের বুকে আগুন চল্‌কে উঠলো। চোখের তারায় বিদ্যুৎ চমকালো।

বাদল গায়ে গতরে খেটে দোকানটাকে পুনরায় খাড়া করে নিয়েছে। পূর্বের মত সন্ধ্যার পর সবাই বসে সেখানে।

পরশুদিন হাটে হাবুলের সাথে দেখা হয়েছিল খগেনের। বিষণ্ণ মুখে বলেছে—

—তোদের কাজ কারবার কেমন চলছেরে হেব্‌লো ?

—ভালই।

—জাল বিক্রি করে দিচ্ছিরে। খদ্দের থাকলে বলিস। জলের দরে বেচে দোব।

হাবুলকে নীরব দেখে পুনরায় বলেছে—তোদের কপাটিতে আমাকে ভর্তি করে নে না।

—আপিসে দেখা করো হয়ে যাবে।

—দেখি যাবো একদিন।

খগেন যে কাহিল কথাতেই বোঝা যাচ্ছে। মনে মনে খুশি হয়েছে হাবুল। তার মুখ থেকে শুনে অন্যেরাও খুশি। জব্দ হলে তবে দাবি মানবে। ও বিক্রি ফিক্রি ফাঁকা আওয়াজ। বাতেলা। ঢপ মেরেছে।

আর কয়েকদিন যাক সুড় সুড় করে এসে বলবে—

—তোদের কথাই থাকরে কার্ত্তিক। তিন ভাগই দোব। গাঙে নাব। জাল বাঁচুক। নৌকা বাঁচুক। মান বাঁচুক। জান বাঁচুক। তোরা বাঁচ। আমি বাঁচি।

আসন্ন জয়ের স্বপ্নে ইলিশমারাদের মুখ খুশি খুশি। দু'চোখের তারায় চলকাচ্ছে স্বপ্নিল মেখলা। হঠাৎ একদিন সকালে দেখলো মহাজনের সব নৌকা জলে ভাসছে। সব জাল গাঙে নেমেছে।

এ্যাঁ! কী ব্যাপার। কে ভাসালো মহাজনের নৌকা? কে বেইমানী করলো! মহাজনের পা চাটা চামচা কে আছে আমাদের মধ্যে। খোঁজ। খোঁজ। অনুসন্ধান করে দেখা গেল বিষ্টুপুরের কেউ বেইমানী করেনি। বেশি মজুরি কবুল করে হাকিমগঞ্জ থেকে লোক ভাড়া করে এনেছে

খগেন। অশ্বিনীও সঙ্গে আছে।

ইলিশমারাদের কালো চোখের তারায় পুনরায় আগুন চমকালো। লড়াই নতুন করে শুরু হলো নতুন পথে।

কার্ত্তিক বললো – এ হতে পারেনে।

মৈনুদ্দিন বললো – মোরা নড়াই করছি প্যাটের জন্যে। আর ভীন দেশি মানুষ মোদের প্যাটে নাতি মারবে সহ্য হয় কি করে।

পরের দিন সকালে আরো একটা ঘটনা ঘটলো। তাতে প্রমাণ হচ্ছে মহাজন পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে চাইছে। আবার একটা হাঙ্গামা হুজ্জুৎ হোক। পুলিশ ধরে নিয়ে যাক। সেই সুযোগে ফাঁকা মাঠে গোল দেবে এই বোধ হয় ওদের পরিকল্পনা।

রাতের জোয়ার দেখে ইলিশ নিয়ে সমবায়ের নৌকা যখন ঘাটে ভিড়লো তখন খগেনের নৌকাও ঘাটে লাগলো। ঘাটের একটা অলিখিত নিয়মনীতি আছে। সবাই তা মেনে চলে। নৌকাগুলোকে এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হবে যাতে অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি না করে। কাজের শেষে যে যার নৌকা সহজে বের করে নিতে পারবে। ভীন দেশী মাঝি বেপরোয়াভাবে এখানকার নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে নৌকা নোঙ্গর করলো বে-পোট জায়গায়। কয়েকখানা নৌকা অন্য সব নৌকার পথরোধ করে দাঁড়ালো। না যাচ্ছে ঢোকা না যাচ্ছে বেরুনো। মহাবিপদ। কার্ত্তিক রুক্ষ কণ্ঠে ঠিক করে লাগাতে বললো। প্রত্যুত্তরে খিস্তি দিল খগেনের মাঝি। কার্ত্তিক দিল পাল্টা। বাড়তে বাড়তে শেষে বচসা। হাতাহাতি হবার উপক্রম।

মাছের হিসাব নেবার জন্যে পাড়ে দাঁড়িয়েছিল খগেনের ছেলে। বিনা প্ররোচনায় কার্ত্তিকের গালে সাঁটিয়ে দিল একটা চড়। অশ্লীল খিস্তি দিয়ে বললো –

– এটা তোর বাপের কেনা জায়গারে শুয়ারের বাচ্ছা? ওরা আগে এসেছে, নৌকা বেঁধেছে। তোদের না পোষায় অন্য ঘাটে যা।

কার্ত্তিক কে মারতে দেখে শ্রীকান্ত লগি হাতে লাফিয়ে পড়লো

সামনে। খগেনের ব্যাটার মাথা লক্ষ্য করে লগি চালাবার পূর্বেই মৈনুদ্দিন দু'হাত তুলে আটকালো।

—থাম থাম। এখুন মাথা গরম করলে চলে?

—থামবো?

মাথায় আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। এতকাল মহাজনের অত্যাচার অবিচার অনাচার সহ্য করেছে অবনত মস্তকে। এখন জীবন বাজি রাখা প্রাণপাতে জাল নৌকা হয়েছে।

বহু দিনের স্বপ্ন অবয়ব গ্রহণ করছে তাই গাত্রদাহ মহাজনের? হাড়ে কাঁপন ধরেছে? সব হারানোর ভয়ে ভীত? দিনদিন হিংস্র হচ্ছে। প্ররোচনা সৃষ্টি করছে?

শ্রীকান্ত রাগে ফুলতে ফুলতে বললো—

—তুমি তো থামালে চাচা। সি দিনের ফচকে, তেঁতুল তলা দিয়ে হাঁটলে গলায় দুধ জমে যাবে। গলা টিপলে দুধ বেরুবে। সে মারলো বাপের বয়সী মানুষকে!

—সবে তো শুরু। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। ছটপট করছে। এরপর তেড়ে কামড়াতে আসবে। এখন চেপে যা। মাথা গরম করলে চলবেনে। অনেক কাজ বাকি।

॥ ১৫ ॥

শনশনে গভীর রাত।

তরল জ্যোৎস্না আকাশের শরীরে। জোয়ারের জলকল্লোল আছড়াচ্ছে দু'ই তীরে। বয়ার লাল আলো দানবের রক্তচক্ষুর মত দপ দপ করছে। দেয়ালি রাতের দীপমালার মত দূরে দেখা যাচ্ছে বিরলা কারখানার জেটির আলো।

কয়েকটি নৌকা দ্রুত গতিতে এবং সন্তর্পণে গিয়ে ভিড়লো খগেনের নৌকাগুলোর গায়ে। নৌকাগুলো থেকে অনেক মানুষ লাফিয়ে পড়লো ও নৌকায়। মাথায় গামছার ফেটি। হাতে লাঠি বল্লম শাবল। কার্ত্তিক লাঠি বাগিয়ে হেঁকে বললো—

—ত্যাখো ভাইসব। আমরা প্যাটের জন্যি নড়াই করছি! তোমরা ভীন দেশী মানুষ কেন আমাদের প্যাটে নাতি মারছো?

খগেনের ভাড়া করা মাঝিদের মধ্যে ছিল হাকিমগঞ্জের মস্তান মোশারফ। সাথে অশ্বিনী।

অশ্বিনী চিৎকার করে বললো—কুন শালারে।

—তোর বাপ রে শালা খান্কীর বাচ্ছা। দ্বিগুণ জোরে হাঁকালো কার্ত্তিক।

—এখুনো বলছি তোমাদের দেশে গেরামে ফিরে যাও। কাজ কাম করো। মাগ ছেলে পালো। এতগুলো নোকের ভাত মেরুনি।

ভাড়া করা লোক মোশারফ। খগেনের নির্দেশ ছিল। আচমকা কার্ত্তিকের কাঁধে এসে পড়লো মোশারফের লাঠি। টাল সামলাতে না পেরে কাত্তিক টলে পড়লো জলে। পুনরায় লাঠি পড়বার আগেই হাবুলের বল্লম সোজা বিঁধলো মোশারফের উরুতে। সেও লটকে পড়লো জলে।

এমন ঘটনা ঘটতে পারে পূর্বেই আন্দাজ করেছিল মৈনুদ্দিন। প্রস্তুত ছিল সবাই। শুরু হলো চল্লিশটা লাঠির খেলা। সঙ্গে বল্লম শাবল। আক্রমণ প্রতি আক্রমণ। মরণপণ লড়াই। একদল পেটের জন্যে। অন্যদল টাকার জন্যে। অন্ধকার নদীবক্ষে বহু মানুষের চিৎকার মধ্য রাতের বাতাস কে ফালা ফালা করছে।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন কতক্ষণ লড়বে এতগুলো মানুষের সাথে। বিদেশ। অচেনা অজানা জায়গা। অন্ধকার রাত। লাঠি বল্লমের আঘাতে খগেনের কয়েকজন লটকে পড়লো জলে। কয়েকজন লাফিয়ে জলে পড়ে সাঁতরে পালালো পাড়ের দিকে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম হে।

—কার্ত্তিক কোথা কার্ত্তিক ? মৈনুদ্দিনের ব্যাকুল প্রশ্ন।

ততক্ষণে কার্ত্তিক কে কালী তুলে নিয়েছে তার নৌকায়।

—চাচা আমি এখেনে। হেঁকে বললো কার্ত্তিক।

—নেগেছে খুব ?

—হ্যাঁ।

কয়েক মিনিটেই ফাঁকা। মহাজনের ভাড়াটে লোকেরা নৌকা ফেলে পালিয়েছে। অবলম্বনহীন নৌকাগুলো ভাসছে মাঝ দরিয়ায়।

মৈনুদ্দিন বললো—দে শালার নৈকো ডুবিয়ে দে।

বঞ্চিত ইলিশমারাদের ক্রোধ গিয়ে পড়লো নৌকাগুলোর ওপর। সবাই উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো। জাল টুকরো টুকরো করে ডুবিয়ে দিল, চোঙা কেটে ভাসিয়ে দিল। কালী হাবুল শ্রীকান্ত সুধীর মোহন গোকুল নরেন কেষ্ট শাবল হাতে মত্ত হাতির মত দাপিয়ে বেড়ালো মহাজনের নৌকাগুলোতে। শাবলের আঘাতে নৌকার তলা ফাঁসিয়ে দিল ভটাভট। প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্রোধ তাদের চারপাশ ঘিরে জ্বলছে দাউ দাউ করে।

কিছুক্ষণ অনিশ্চিত চক্কর দিয়ে নদীর গভীর জলে তলিয়ে গেল মহাজনের সতেরোখানা নৌকা।

পরেরদিন সকালের জোয়ারে কোথাও দেখা গেল না মহাজনের নৌকাগুলো। লাল নিশান উড়িয়ে ভাসছে শুধু সমবায়ের নৌকা। আর কালী দু'হাত তুলে গাইছে—

পিরীতের বন্ধুরে যাইল্যা কোন দ্যাশে
তোরে ভালবাইস্যা আমি
মরবো বুঝি শ্যাষে
ও পিরীতের বন্ধুরে—এ—এ।

—